ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজকে
একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন

একাদশী মাহাত্ম্য

জীবের কল্যাণে পরমেশ্বর ভগবান একাদশী রূপে আবির্ভূত হলেন

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবায় নমঃ

শ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য

(মহাদ্বাদশী সমন্বিত)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের

অনুকম্পিত

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের

আশীর্বাদধন্য

শ্রীনির্মলচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী

কর্তৃক সংকলিত

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস এ্যাঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, রোম

EKADASHI MAHATMYA (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীনৃসিংহ চতুর্দশী
২২ মে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ,
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ বঙ্গাব্দ,
২৮ মধুসূদন ৫১৯ গৌরাব্দ।
৩০০০ কপি।

মুদ্রণ ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

ভূমিকা

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট রয়েছে। তাই মায়া তাকে এ জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে। পরম করুণাময় ভগবান কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত করতে মায়াগ্রস্ত জীবের কল্যাণে বেদপুরাণ আদি শাস্ত্রগ্রন্থাবলী দান করেছেন।

ভক্তি হচ্ছে ভগবানকে জানার ও ভগবৎ প্রীতি সাধনের একমাত্র সহজ উপায়। শাস্ত্রে যে চৌষট্টি প্রকার ভক্ত্যাঙ্গের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে একাদশী ব্রত সর্বোত্তম। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি নবধা ভক্তির পরই দশম ভক্ত্যাঙ্গরূপে একাদশীর স্থান। এই তিথিকে হরিবাসর বলা হয়। তাই ভক্তি লাভেচ্ছু সকলেরই একাদশী ব্রত পালনের পরম উপযোগিতার কথা বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

একাদশী তিথি সকলের অভীষ্ট প্রদানকারী। এই ব্রত পালনে সমস্ত প্রকার পাপ বিনষ্ট, সর্বসৌভাগ্য ও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান হয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আট থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত যেকোন ব্যক্তিরই ভক্তিসহকারে পবিত্র একাদশী ব্রত পালন করা কর্তব্য। সঙ্কটজনক অবস্থা বা জন্মমৃত্যুর অশৌচে কখনও একাদশী পরিত্যাগ করতে নেই। একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হলে সেইদিন না করে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করা উচিত। শুধু বৈষ্ণবেরাই নয়, শিবের উপাসক, সূর্য-চন্দ্র-ইন্দ্রাদি যেকোন দেবোপাসক, সকলেরই কর্তব্য একাদশী ব্রত পালন করা।

দুর্লভ মানবজীবন লাভ করেও এই ব্রত অনুষ্ঠান না করলে বহু দুঃখে-কষ্টে চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করতে হয়। অহংকারবশত একাদশী ব্রত ত্যাগ করলে অশেষ যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যে ব্যক্তি এই ব্রতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, জীবিত হয়েও সে মৃতের সমান।

কেউ যদি বলে "একাদশী পালনের দরকারটা কি?" সে নিশ্চয় কুম্ভিপাক নরকের যাত্রী। যারা একাদশী পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে শনির কোপে তারা বিনষ্ট হয়। একাদশীকে উপেক্ষা করে তীর্থ স্নান আদি অন্য ব্রত পালনকারীর অবস্থা গাছের গোড়া কেটে পাতায় জল দানের মতোই। একাদশী বাদ দিয়ে যারা দেহধর্মে অধিক আগ্রহ দেখায়, ধর্মের নামে পাপরাশিতে তাদের উদর পূর্ণ হয়। কলহ-বিবাদের কারণেও একাদশী দিনে উপবাস করলে অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চিত হয়। পুণ্যপ্রদায়িনী সর্বশ্রেষ্ঠ এই ব্রত শ্রীহরির অতি প্রিয়। একাদশী ব্রত পালনে যে ফল লাভ হয়, অশ্বমেধ, রাজসূয় ও বাজপেয় যজ্ঞদ্বারাও তা হয় না। দেবরাজ ইন্দ্রও যথাবিধি একাদশী পালনকারীকে সম্মান করেন। একাদশী ব্রতে ভাগবত শ্রবণে পৃথিবী দানের ফল লাভ হয়। অনাহারে থেকে হরিনাম, হরিকথা রাত্রিজাগরণে একাদশী পালন করা কর্তব্য। কেউ যদি একাদশী ব্রতে শুধু উপবাস করে তাতে বহু ফল পাওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্তেরা এই দিনে একাদশ ইন্দ্রিয়কে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করেন।

একাদশীতে শস্যমধ্যে সমস্ত পাপ অবস্থান করে। তাই চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, সরিষা আদি জাতীয় খাদ্যদ্রব্য একাদশী দিনে বর্জন করা উচিত। নির্জলা উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি জল, দুধ, ফল-মূল এমনকি আলু, পেঁপে, কলা, ঘিয়ে বা বাদাম তেল অথবা সূর্যমুখী তেলে রান্না অনুকল্প প্রসাদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন। রবিশস্য (ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও সরিষা) ও সোয়াবিন তেল অবশ্যই বর্জনীয়। দশমী বিদ্ধা একাদশীর দিন বাদ দিয়ে দ্বাদশী বিদ্ধা একাদশী ব্রত পালন করতে হয়। একাদশীতে সূর্যোদয়ের পূর্বে বা সূর্যোদয়কালে (১ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের মধ্যে) যদি দশমী স্পর্শ হয়, তাকে দশমী বিদ্ধা বলে জেনে পরদিন একাদশীব্রত পালন করতে হয়। মহাদ্বাদশীর আগমন হলে একাদশীর উপবাস ব্রতটি মহাদ্বাদশীতেই করতে হয়। একাদশী

ব্রত করে পরের দিন উপযুক্ত সময়ে শস্যজাতীয় প্রসাদ গ্রহণ করে পারণ করতে হয়। শাস্ত্রবিধি না মেনে নিজের মনগড়া একাদশী ব্রত করলে কোন ফল লাভ হয় না। দৈববশত যদি কখনও একাদশী ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে ক্ষমা ভিক্ষা করে পুনরায় ব্রত পালন করতে হয়।

গঙ্গাস্নানে যেমন সবার অধিকার আছে তেমনি একাদশী ব্রতের অধিকারীও সকলেই। শাস্ত্রে বিধবা, সধবা সকলের জন্যই একাদশী ব্রত পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা সধবার একাদশী পছন্দ করেন না, শাস্ত্রে তাদের বিষ্ণুদ্রোহী বলা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর লীলাবিলাসের প্রথম থেকেই একাদশী ব্রত পালনের প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর 'ভক্তিসন্দর্ভে' 'স্কন্দপুরাণ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন "যে মানুষ একাদশীর দিন শস্যদানা গ্রহণ করে, সে তার পিতা-মাতা, ভাই ও গুরুহত্যাকারী। সে যদি বৈকুণ্ঠলোকেও উন্নীত হয় তবুও তার পতন হয়। একাদশীর দিন ভগবানের জন্য সবকিছু রন্ধন করা হয়, এমনকি অন্ন-ডালও। কিন্তু সেই অন্নপ্রসাদ সেইদিন গ্রহণ করা উচিত নয়। সেই প্রসাদ পরের দিন গ্রহণ করার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। 'শ্রীপুরীধামে জগন্নাথের অন্নপ্রসাদ গ্রহণে দোষ নেই'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকেই একাদশীতে নিঃসঙ্কোচে অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন। এটি সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিচার।

একাদশীতে উপবাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে কেবল অনাহারে উপবাস করাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা ও প্রেমপরায়ণ হওয়া। 'উপ' মানে নিকটে, 'বাস' মানে অবস্থান করা অর্থাৎ শ্রীহরির নিকটে অবস্থান করা। একাদশীর দিন উপবাস করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, শারীরিক আবশ্যকতাগুলি খর্ব করে ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং অন্যভাবে ভগবানের সেবা করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা।

ভোরে শয্যা ত্যাগ করে শুচিশুদ্ধ হয়ে শ্রীহরির মঙ্গল আরতিতে অংশগ্রহণ করতে হয়। শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা করতে হয়, "হে শ্রীকৃষ্ণ, আজ যেন এই মঙ্গলময়ী পবিত্র একাদশী সুন্দরভাবে পালন করতে পারি, আপনি আমাকে কৃপা করুন।" একাদশীতে গায়ে তেল মাখা, সাবান মাখা, পরনিন্দা-পরচর্চা, মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, দিবানিদ্রা, সাংসারিক আলাপাদি বর্জনীয়।

এই দিন গঙ্গা আদি তীর্থে স্নান করতে হয়। মন্দির মার্জন, শ্রীহরির পূজার্চনা, স্তবস্তুতি, গীতা-ভাগবত পাঠ আলোচনায় বেশি করে সময় অতিবাহিত করতে হয়। এই তিথিতে গোবিন্দের লীলা স্মরণ এবং তাঁর দিব্য নাম শ্রবণ করাই হচ্ছে সর্বোত্তম। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের একাদশীতে পঁচিশ মালা বা যথেষ্ট সময় পেলে আরো বেশি জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। একাদশীর দিন ক্ষৌরকর্মাদি নিষিদ্ধ।

একাদশী ব্রত পালনে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আদি বহু অনিত্য ফলের উল্লেখ শাস্ত্রে থাকলেও শ্রীহরিভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেম লাভই এই ব্রত পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভক্তগণ শ্রীহরির সন্তোষ বিধানের জন্যই এই ব্রত পালন করেন। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস আদি গ্রন্থে এসকল কথা বর্ণিত আছে।

বছরে ছাব্বিশটি একাদশী আসে। সাধারণত বার মাসে চব্বিশটি একাদশী। এইগুলি হচ্ছে—উৎপন্না, মোক্ষদা, সফলা, পুত্রদা, ষট্‌তিলা, জয়া, বিজয়া, আমলকী, পাপমোচনী, কামদা, বরুথিনী, মোহিনী, অপরা, নির্জলা, যোগিনী, শয়ন, কামিকা, পবিত্রা, অন্নদা, পরিবর্তিনী বা পার্শ্ব, ইন্দিরা, পাশাঙ্কুশা, রমা এবং উত্থান। কিন্তু যে বৎসর পুরুষোত্তমাস, অধিমাস বা মলমাস থাকে, সেই বৎসর পদ্মিনী ও পরমা নামে আরও দুটি একাদশীর আবির্ভাব হয়। যারা যথাবিধি একাদশী উপবাসে অসমর্থ অথবা ব্রতদিনে সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণে অসমর্থ, তারা এই একাদশী মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করলে অসীম সৌভাগ্যের অধিকারী হবেন।

একাদশী-তত্ত্ব

পদ্মপুরাণে একাদশী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। একসময় জৈমিনি ঋষি তাঁর গুরুদেব মহর্ষি ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গুরুদেব! একাদশী কি? একাদশীতে কেন উপবাস করতে হয়? একাদশী ব্রত করলে কি লা ? একাদশী ব্রত না করলে কি ক্ষতি? এ সব বিষয়ে আপনি দয়া ক রে বলুন।

মহর্ষি ব্যাস দেব তখন বলতে লাগলেন—সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর ভগবান এই জ ড় সংসারে স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করলেন। মর্ত্যলোকবাসী মানুষদের শাস নের জন্য একটি পাপপুরুষ নির্মাণ করলেন। সেই পাপপুরুষের অ ঙ্গগুলি বিভিন্ন পাপ দিয়েই নির্মিত হল। পাপপুরুষের মাথাটি ব্রহ্মহত্য া পাপ দিয়ে, চক্ষুদুটি মদ্যপান, মুখ স্বর্ণ অপহরণ, দুই কর্ণ—গুরুপত্নী গমন, দুই নাসিকা—স্ত্রীহত্যা, দুই বাহু—গোহত্যা পাপ, গ্রীবা—ধন অপ হরণ, গলদেশ—ভ্রূণহত্যা, বক্ষ—পরস্ত্রী-গমন, উদর—আত্মীয়স্বজন বধ, নাভি—শরণাগত বধ, কোমর—আত্মশ্লাঘা, দুই উরু—গুরুনিন্দ া, শিশ্ন—কন্যা বিক্রি, মলদ্বার—গুপ্তকথা প্রকাশ পাপ, দুই পা—পিতৃহ ত্যা, শরীরের রোম—সমস্ত উপপাতক। এভাবে বিভিন্ন সমস্ত পাপ দ্বা রা ভয়ঙ্কর পাপপুরুষ নির্মিত হল।

পাপপুরুষের ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে ভগবান শ্রীবিষ্ণু মর্ত্যের মানব জাতির দুঃখমো চন করবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন গরুড়ের পিঠে চড়ে ভগবান চললেন যমরাজের মন্দিরে। ভগবানকে যমরাজ উপযু ক্ত স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি দিয়ে যথাবিধি তাঁর পূজা করলেন।

যমরাজের স ঙ্গে কথোপকথনকালে ভগবান শুনতে পেলেন দক্ষিণ দিক থেকে অস ংখ্য জীবের আর্তক্রন্দন ধ্বনি। প্রশ্ন করলেন—এ আর্তক্রন্দন কেন ?

যমরাজ বল লেন, হে প্রভু, মর্ত্যের পাপী মানুষেরা নিজ কর্মদোষে নরকযাতনা ভো গ করছে। সেই যাতনার আর্ত চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

যন্ত্রণাকাতর পাপাচারী জীবদের দর্শন করে করুণাময় ভগবান চিন্তা করলেন—আমিই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেছি, আমার সামনেই ওরা কর্মদোষে দুষ্ট হয়ে নরক যাতনা ভোগ করছে, এখন আমিই এদের সদ্‌গতির ব্যবস্থা করব।

ভগবান শ্রীহরি সেই পাপাচারীদের সামনে একাদশী তিথি রূপে এক দেবীমূর্তিতে প্রকাশিত হলেন। সেই পাপীদেরকে একাদশী ব্রত আচরণ করালেন। একাদশী ব্রতের ফলে তারা সর্বপাপ মুক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করল।

শ্রীব্যাসদেব বললেন, হে জৈমিনি! শ্রীহরির প্রকাশ এই একাদশী সমস্ত সুকর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত ব্রতের মধ্যে উত্তম ব্রত।

কিছুদিন পরে ভগবানের সৃষ্ট পাপপুরুষ এসে শ্রীহরির কাছে করজোড়ে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগল—হে ভগবান! আমি আপনার প্রজা। আমাকে যারা আশ্রয় করে থাকে, তাদের কর্ম অনুযায়ী তাদের দুঃখ দান করাই আমার কাজ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি একাদশীর প্রভাবে আমি কিছুই করতে পারছি না, বরং ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি। কেননা একাদশী ব্রতের ফলে প্রায় সব পাপাচারীরা বৈকুণ্ঠের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে। হে ভগবান, এখন আমার কি হবে? আমি কাকে আশ্রয় করে থাকব? সবাই যদি বৈকুণ্ঠে চলে যায়, তবে এই মর্ত্য জগতের কি হবে? আপনি বা কার সঙ্গে এই মর্ত্যে ক্রীড়া করবেন?

পাপপুরুষ প্রার্থনা করতে লাগল—হে ভগবান, যদি আপনার এই সৃষ্ট বিশ্বে ক্রীড়া করবার ইচ্ছা থাকে তবে, আমার দুঃখ দূর করুন। একাদশী তিথির ভয় থেকে আমাকে রক্ষা করুন। হে কৈটভনাশন, আমি একমাত্র একাদশীর ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করছি। মানুষ, পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ, জল-স্থল, বন-প্রান্তর, পর্বত-সমুদ্র, বৃক্ষ, নদী, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সর্বত্রই আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু একাদশীর প্রভাবে কোথাও নির্ভয় স্থান পাচ্ছি না দেখে আজ আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

হে ভগবান, এখন দেখছি, আপনার সৃষ্ট অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একাদশীই প্রাধান্য লাভ করেছে, সেইজন্য আমি কোথাও আশ্রয় পেতে পারছি না। আপনি কৃপা করে আমাকে একটি নির্ভয় স্থান প্রদান করুন।

পাপপুরুষের প্রার্থনা শুনে ভগবান শ্রীহরি বলতে লাগলেন—হে পাপপুরুষ! তুমি দুঃখ করো না। যখন একাদশী তিথি এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করতে আবির্ভূত হবে, তখন তুমি অন্ন ও রবিশস্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তা হলে আমার মূর্তি একাদশী তোমাকে বধ করতে পারবে না।

একাদশীব্রত মাহাত্ম্য

ভদ্রশীলের কাহিনী

পুরাকালে গালব নামে এক মহান মুনি নর্মদা নদীর তীরে বাস করতেন। তাঁর ভদ্রশীল নামে এক বিষ্ণুভক্ত পুত্র ছিল। সে ছোটবেলা থেকে বিষ্ণুমূর্তি বানিয়ে পূজা করত। বালক হয়েও লোককে বিষ্ণুপূজার উপদেশ ও একাদশী পালন করতে নির্দেশ দিত, নিজেও পালন করত। পিতা একদিন জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা ভদ্রশীল! তুমি অতি ভাগ্যবান। তুমি বলো তো, রোজ শ্রীহরির পূজা করা, একাদশী তিথি পালন করা—এরূপ ভক্তি কিভাবে তোমার উদয় হল?"

উত্তরে ভদ্রশীল বলতে লাগল—বাবা! আমি পূর্বজন্মের কথা ভুলিনি। আগের জন্মে যমপুরীতে গিয়েছিলাম। সেখানে যমরাজ আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ করেছিলেন। পিতা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন—ভদ্রশীল, তুমি পূর্বে কে ছিলে? যমরাজ তোমাকে কি বলেছিল, সব কিছুই আমাকে বলো।

ভদ্রশীল বলল—বাবা! আমি পূর্বে চন্দ্রবংশের এক রাজা ছিলাম। তখন আমার নাম ছিল ধর্মকীর্তি। ভগবান দত্তাত্রেয় আমার গুরু ছিলেন। নয় হাজার বছর আমি পৃথিবী শাসন করেছিলাম। বহু ধর্ম-কর্ম করেছিলাম। পরে যখন আমার অনেক ধনসম্পদ হল তখন আমি পাগলের মতো অধর্ম করতে লাগলাম। কতগুলি পাষণ্ড ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করতাম। আর কেবল কথা আলাপের ফলেই আমার বহু দিনের অর্জিত পুণ্য নষ্ট হয়ে গেল। আমিও পাষণ্ডী হয়ে গেলাম। তাদের কুযুক্তি নিয়ে যাগযজ্ঞ আদি পুণ্যকর্ম বাদ দিলাম। ফলে আমার সব প্রজারাও অধর্ম করতে লাগল। প্রজাদের প্রত্যেকের অধর্মের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজাকেই গ্রহণ করতে হয়।

তারপর একদিন আমি সৈন্যদের সঙ্গে বনে মৃগয়া করতে গেলাম। বহু পশু বধ করলাম। তারপর আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ও ক্লান্ত

হয়ে রেবা নদীর তীরে গেলাম। প্রখর রোদে তপ্ত হয়ে নদীতে স্নান করলাম। কিন্তু তারপর আমার কোন সেনাকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত ও অতিশয় ক্ষুধার্ত হলাম। অন্ধকার হয়ে এল। আমি পথ ঠিক করতে পারলাম না। তারপর এক জায়গায় গিয়ে কয়েকজন তীর্থবাসীকে দেখলাম। জানলাম তারা একাদশী ব্রত করেছে। তারা সারাদিন কিছু খায়নি, জলপান পর্যন্তও করেনি। আমি তাদের সঙ্গে পড়ে রাত্রি জাগরণ করলাম। কিন্তু ক্লান্তি ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে রাত্রি জাগরণের পর আমার মৃত্যু হল। তখন দেখলাম বড় বড় দাঁত বিশিষ্ট দুজন ভয়ংকর যমদূত এসে আমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধল। আর ক্লেশময় পথ দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলল। তারপর যমপুরীতে পৌঁছলাম। যমরাজও দেখতে তখন ভয়ংকর। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে ডেকে আমাকে দেখিয়ে বললেন—পণ্ডিত! এই ব্যক্তির যেরূপ শিক্ষাবিধান তুমি তা বলো। চিত্রগুপ্ত কিছুক্ষণ বিচার করে ধর্মরাজ যমকে বললেন—হে ধর্মপাল! এই ব্যক্তি পাপকর্মেই রত ছিল সত্য, কিন্তু তবুও একাদশীর উপবাস জন্য সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। তীর্থবাস ও রাত্রি-জাগরণও করেছে। তাই ওর সব পাপ নষ্ট হয়েছে।

চিত্রগুপ্ত এই কথা বললে যমরাজ খুব চমকে উঠলেন, তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে আমাকে পূজা করতে লাগলেন। তারপর তাঁর দূতদের আহ্বান করে বলতে লাগলেন—হে দূতগণ! তোমরা ভাল করে আমার কথা শোনো। তোমাদের মঙ্গলজনক কথা আমি বলছি। যে সব মানুষ ধর্মরত, তোমরা তাদেরকে এখানে আনবে না। যাঁরা শ্রীহরির ভক্ত, পবিত্র, একাদশীব্রত পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁদের মুখে সর্বদা 'হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে কৃষ্ণ, হে হরি' উচ্চারিত হয়; যাঁরা সকল লোকের হিতকারী ও শান্তিপ্রিয়, তাদেরকে তোমরা দূর থেকেই পরিত্যাগ করবে। কারণ, সেই সব ব্যক্তিকে আমার শিক্ষা দেবার অধিকার নেই। যাঁরা সর্বদা

হরিনামে আসক্ত, সর্বদা হরিকথা শ্রবণে আগ্রহী, যাঁরা পাষণ্ডগণের সঙ্গ করে না, ভক্তদের শ্রদ্ধা করে, সাধুসেবা অতিথিসেবা পরায়ণ, তাঁদেরকে পরিত্যাগ করবে।

হে দূতগণ! তোমরা শুধু তাদেরকেই আমার কাছে ধরে আনবে, যারা উগ্রস্বভাব, ভক্তদের অনিষ্ট করে, লোকদের সঙ্গে কলহ বাধায়, একাদশী ব্রত পালনে একান্ত পরাঙ্মুখ, পরনিন্দুক, ব্রাহ্মণের ধনে লোভ পরতন্ত্র, হরিভক্তি বিমুখ, যারা ভগবদ্ বিগ্রহ দেখে শ্রদ্ধাবত হয় না, মন্দির দর্শনে যাদের আগ্রহ নেই, অন্যের অপবাদ করে বেড়ায়, তাদের সবাইকে বেঁধে এখানে নিয়ে আসবে।'

যমরাজের মুখে এসব কথা শুনে আমি আমার পাপকর্মের জন্য অত্যন্ত অনুশোচনা করতে থাকি। তারপর আমি সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেহ লাভ করলাম। একটি দিব্য বিমানে চড়িয়ে আমাকে যমরাজ দিব্যলোকে পাঠিয়ে দিলেন। কোটি কল্প সেখানে অবস্থান করার পর ইন্দ্রলোক, স্বর্গে নেমে আসি। সেখানে বহুকাল যাবৎ অবস্থান করার পর এই পৃথিবীতে এসে সদাচারী মহান ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছি।

আমার জাতিস্মরতা হেতু এসব ঘটনা আমার হৃদয়ে জাগ্রত আছে। আমি পূর্বে একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য জানতাম না। অনিচ্ছাকৃতভাবে যখন একাদশী পালনে এত ফল লাভ করেছি। তাহলে ভক্তি সহকারে একাদশী ব্রত উপবাস করলে কি প্রকার ফল লাভ হয় তা জানি না। তাই বৈকুণ্ঠধামে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছায় আমি পবিত্র একাদশীব্রত ও প্রতিদিন বিষ্ণুপূজা করব এবং অন্যদেরও এসব পালন করতে উৎসাহী করব।

পুত্রের কথা শুনে গালব মুনি অতি সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, আমার বংশে এই পরম বিষ্ণুভক্তের জন্ম হয়েছে, তাই আমার জন্ম সফল, আমার বংশও পবিত্র হল।

কোটিরথ ও সুপ্রজ্ঞার কাহিনী

পুরাকালে রাজা কোটিরথ ও রাণী সুপ্রজ্ঞা ধর্মনিষ্ঠাপরায়ণ সর্বসদ্‌গুণযুক্ত দম্পতি ছিলেন। তাঁরা জাতিস্মর ছিলেন। একাদশীতে তাঁরা জল পর্যন্ত গ্রহণ না করে শ্রীহরির পূজা কীর্তন ভজনে দিবারাত্র অতিবাহিত করতেন।

একদিন হরিবাসরে শৌরি নামে এক তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হন। রাজা শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁকে আসনে বসালেন। রাজদম্পতি সহ বহু ব্রতীকে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়ে ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন—হে রাজন্! আপনারা উভয়েই ধন্য। আপনাদের মতো বৈষ্ণব এই জগতে দুর্লভ। আপনাদের এরকম বুদ্ধি কিভাবে হল? রাণী সুপ্রজ্ঞা বললেন—আমরা পূর্ব জন্মে মহাপাতকী ছিলাম। কিন্তু একাদশীর প্রভাবে যমদণ্ড থেকে মুক্ত হয়েছি। সেই স্মৃতি প্রভাবে শ্রীহরির অক্ষয় ধাম লাভের জন্য একাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করছি।

ব্রাহ্মণ বললেন—যদি আপনার পূর্ব জীবনের কথা স্মরণ করতে পারেন, তবে কৃপা করে আমাকে বিস্তৃত বলুন।

সুপ্রজ্ঞা বলতে লাগলেন—যদিও সেই কথা অপ্রকাশ্য, তবুও মহান বৈষ্ণব আপনার কাছে বর্ণনা করব। আমি পূর্ব জন্মে চিত্রপদা নামে এক বারবনিতা ছিলাম। বহু পাপকর্ম করেছিলাম। এই রাজা নিত্যোদয় নামে এক শূদ্র ছিলেন। নানা অনাচারের জন্য জ্ঞাতিবন্ধুরা পরিত্যাগ করলে ইনি আমার আশ্রয়ে থাকলেন। আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতোই ছিলাম। একদিন মারাত্মক অসুখে পড়লাম। গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। পীড়ায় কাতর হয়ে দিনরাত হে হরি! হে গোবিন্দ! হে নারায়ণ! আমাকে রক্ষা করুন—বলে কাঁদতে লাগলাম। রাত্রে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে জেগেই থাকলাম। সারাদিন কোনও কিছু আহার করিনি, জলও নয়। আমার এরূপ অবস্থা দেখে ইনিও আহার পান না করে না ঘুমিয়ে আমার কাছে বসে শ্রীহরিকে ডাকতে লাগলেন।

পরদিন সূর্যোদয় কালে আমার মৃত্যু হয়। ইনিও অত্যন্ত কাতর হয়ে দেহত্যাগ করলেন। তারপর বিকট ভয়ংকর যমদূতেরা এসে আমাদের খুব শক্ত করে বেঁধে দুর্গম পথে যমপুরীতে নিয়ে গেল।

সেখানে যমরাজ আমাদের পাপ-পুণ্যের বৃত্তান্ত জানতে চিত্রগুপ্তকে নির্দেশ দিলেন। চিত্রগুপ্ত বললেন—'এরা অত্যন্ত পাপী হলেও একাদশীর উপবাস একদিন করেছে। তাই সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়েছে।'

একাদশী ব্রত সম্পর্কে কিছুই না জেনেও আমরা নির্জলা উপবাস থেকে রাত্রি জাগরণ এবং শ্রীহরির নাম করেই দ্বাদশীতে দেহ ত্যাগ করেছিলাম। সেটাই ছিল আমাদের জীবনের পরম সৌভাগ্য।

তখন শুনলাম আমাদের ভগবদ্ধামে গতি হবে। চিত্রগুপ্তের কথা শুনেই যমরাজ তৎক্ষণাৎ নানা সুগন্ধি পুষ্প, চন্দন, বস্ত্র, অলংকার, সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য আমাদের প্রদান করে একটি রথের উপর বসালেন। বললেন—"আপনারা বৈকুণ্ঠে গমন করুন।"

অপ্রত্যাশিতভাবে যমরাজের এরূপ আচরণ দেখে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। আমাদের তখন দেখতে ইচ্ছা হল যে কিভাবে যমপুরীতে পাপীদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। তখন আমাদের কৌতূহল দেখে যমরাজ রথে চড়িয়ে নরককুণ্ডের জীবদের দেখতে পাঠালেন। সেই সব ভয়ংকর নরক আমরা দেখতে লাগলাম।

ব্রাহ্মণ শৌরি তখন বললেন—"আপনারা সেখানে পাপীদের যে সব দুর্দশা দেখলেন তা দয়া করে বলুন।"

সুপ্রজ্ঞা দুঃখিত চিত্তে বলতে লাগলেন—সেখানে বিশাল একটি দুর্গম অতি দুঃখপ্রদ রাস্তা রয়েছে। সেই রাস্তায় কোথাও জ্বলন্ত আগুন, কোথাও উত্তপ্ত কাদা, কোথাও অন্ধকূপ, কোথাও কাঁটাময় গাছ, কোথাও কঙ্কালের স্তূপ, কোথাও ভয়ংকর জন্তুর গর্জন। সেই ক্লেশপূর্ণ পথ দিয়ে যমদূতেরা পাপীদের টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পাপীদের

কারও গলায়, কারও কানে, কারও নাকে অঙ্কুশ দিয়ে প্রহার করা হচ্ছে, কারও কান ছিদ্র করে ভারী পাথর ঝুলিয়ে, কারও শিশ্নতে লোহা বেঁধে, ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে, কারও মাথা নিচু করে পা উপরে করে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে যমপুরীতে মারা যাচ্ছে, সেখানে ভয়ংকর রূপ ধরে যমরাজ সেইসব পাপীদের ধমক দিয়ে বলছেন—"তোমরা মূর্খ, আমাকে অগ্রাহ্য করে জগতে নানা দুরাচারে রত হয়েছ, তোমাদের পাপের উপযুক্ত দণ্ড এখন লাভ কর।" সারিবদ্ধ হয়ে পাপীরা দাঁড়িয়ে থাকে। চিত্রগুপ্ত প্রত্যেকের পাপকর্মের কথা বলতে থাকেন। মাঝে মাঝে পাপীরা অভিযোগ করে—"আমি এত পাপ করেছি কি করে বলছেন?" তখন যমরাজের আহ্বানে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী, জল, তিথি, দিবা, রাত্রি, উষা, সন্ধ্যা, ধর্ম—ইত্যাদি বহু সাক্ষী এসে পাপীদের পাপ কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

ভীষণরূপ যমদূতেরা পাপীদের বিচারের পর নরককুণ্ডের মধ্য নিয়ে যায়। কাউকে বিষ্ঠার গর্তে, কাউকে তপ্তকূপে, কাউকে কাঁটার গর্তে নিক্ষেপ করে। কেউ নিজ মাংস ভক্ষণ, কেউ মলমূত্র ভক্ষণ, কেউ শুক্র বা রক্তপান করতে থাকে। কাউকে পা বেঁধে মাথাটিকে পাথরের উপর আছাড় দেওয়া হয়। বঁড়শি কাঁটা দিয়ে কারও চোখ উৎপাটন করা হয়। কাউকে গাছের ডালে বেঁধে আগুন ধরানো হয়। কাউকে বিষাক্ত ধূমপান করানো হয়। কাউকে তপ্ত স্থানে শুইয়ে দিয়ে ভারী পাথর বুকের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। কাউকে উত্তপ্ত তেলের কড়াইতে ভাজা হয়, কাউকে বাঘ ভালুকের খাবার জন্য ঠেলে দেওয়া হয়। কাউকে কৃমি ভক্ষণ, দুর্গন্ধ মাংস ভক্ষণ করতে দেওয়া হয়। নাকের মধ্যে কাউকে কাপড় ঢুকিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়।

এইভাবে তারা নরক ভোগ করে যন্ত্রণায় 'ত্রাহি ত্রাহি' করতে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তারা সমস্ত পাপকর্মের ফল ভোগ করে। অবশেষে তাদের একটি পাপযোনিতে জন্মগ্রহণের জন্য পাঠানো হয়।

এইরূপে পাপীদের দুর্গতি পরিদর্শন করে আমরা দুজনে রথে চড়ে ভগবদ্ধামে গমন করলাম। কোটি কল্পকাল সেখানে পরম আনন্দে বাস করে অখিল সম্পদ ভোগ করলাম।

কিন্তু যে একাদশীর কৃপায় আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে এমন সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছি, সেই একাদশীর মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করতে আমাদের অভিলাষ হল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রেরণায় আমরা এই ধরাধামে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছি। এই জন্মে একাদশী ব্রত আচরণ ও তার মাহাত্ম্য প্রচার করে সুখমৃত্যু লাভ করে শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করব।

মহারাজ রুক্মাঙ্গদের কাহিনী

প্রাচীনকালে কৌশিক নগরে রুক্মাঙ্গদ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ। একাদশী ব্রত পালনে তার গভীর নিষ্ঠা ছিল। সমস্ত রাজ্যে তিনি ঘোষণা করতেন—আজ একাদশী তিথি। অতএব আট থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত যে ব্যক্তি আমার রাজ্যে অন্ন ভোজন করবে তাকে হত্যা অথবা রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হবে। আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও এই আদেশ বলবৎ থাকবে। পিতা-মাতা, পতি-পত্নী, পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব সকলকেই এই ব্রত পালন করতে হবে। অন্যথায় কঠোর দণ্ড প্রদান করা হবে। রাজার আদেশে রাজ্যবাসী সকলে একাদশী ব্রত পালন করে বৈকুণ্ঠে যেতে লাগল। ধর্মরাজ যম একেবারে কর্মশূন্য হয়ে পড়লেন। চিত্রগুপ্ত হিসাব-নিকাশের কাজ থেকে অবসর নিলেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ যমপুরীতে উপস্থিত হয়ে যমরাজের সমস্ত দুঃখের কাহিনী শুনলেন। তারপর যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত নারদের সঙ্গে সত্যলোকে গিয়ে ব্রহ্মার কাছে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। ব্রহ্মা যমরাজের সম্মান রক্ষার্থে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। পরে এক পরমা সুন্দরী নারী মূর্তি সৃষ্টি করলেন। এর নাম রাখলেন মোহিনী। তিনি বললেন—এখনই তুমি মন্দার পর্বতে গিয়ে রুক্মাঙ্গদ রাজাকে মোহিত কর।

ব্রহ্মাকে প্রণাম করে মোহিনী মন্দার পর্বতে উপস্থিত হল। সেখানে বসে সে অপূর্ব গান্ধার রাগে গান গাইতে লাগল। গানে আকৃষ্ট হয়ে দেব-দৈত্য ও অন্যান্য সকল প্রাণী সেখানে আসতে শুরু করল।

এদিকে রাজার রুক্মাঙ্গদ তাঁর উপযুক্ত পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে মৃগ শিকারের উদ্দেশ্যে বনে গমন করেন। (হিংস্র প্রাণী বধ ও শত্রু থেকে প্রজাকে রক্ষার অভ্যাসের জন্য পূর্বে রাজারা মৃগয়ায় যেতেন।) বনে গমন করে তিনি বামদেব মুনির আশ্রমে উপনীত হন। মুনির কাছে জানতে পারলেন যে, তিনি পূর্বজন্মে শূদ্র ছিলেন এবং তার দুষ্টা স্ত্রী ছিল, যার ফলে তাকে দারিদ্র দশা ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু ঐ জন্মে একাদশী ব্রত পালনের জন্য এখন এই সমস্ত বৈভব প্রাপ্তি হয়েছে।

মুনির অনুমতি নিয়ে রাজা মন্দার পর্বত অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন অদ্ভুত এক সঙ্গীতের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে পশু-পাখিরা একদিকে ছুটে যাচ্ছে। কৌতূহলবশত রাজাও কিছু সময়ের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হলেন। তপ্তকাঞ্চনবর্ণা পরমা সুন্দরী মোহিনীকে সেখানে দেখতে পেলেন। তাঁকে পত্নীরূপে লাভের বাসনার কথা ব্যক্ত করলেন। মোহিনী বলল—আমি ব্রহ্মার কন্যা, আপনার কীর্তি শ্রবণ করে আপনাকে পতীরূপে লাভের জন্য সঙ্গীতের মাধ্যমে শঙ্করের উপাসনা করছি। এখনই তিনি সেই ফল দান করলেন।

রাজা প্রতিজ্ঞা করে বললেন, 'মোহিনী তুমি যা ইচ্ছা করবে তাই আমি পূরণ করব'। তারপর মোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন।

এভাবে মোহিনীর সঙ্গে বিলাসিতায় আট বছর অতিবাহিত হল। পরের বছর কার্তিক মাস উপস্থিত হলে রাজা মোহিনীকে বললেন—'মোহিনী তোমার সাথে ভোগ-বিলাসে বহুদিন অতিবাহিত করেছি। এবার তোমার মোহ পরিত্যাগ করে কার্তিক ব্রত পালন করতে ইচ্ছা করছি। তুমি আমায় অনুমতি দাও।'

এতদিন নিজ সুখবিলাসে মত্ত থাকলেও রাজা কখনও একাদশী ব্রত পালনে অবহেলা করেন নি। মোহিনী বলল—হে মহারাজ! আপনাকে পরিত্যাগ করে আমি ক্ষণকাল থাকতে পারি না। অতএব ব্রতের পরিবর্তে ব্রাহ্মণদের ভোজন-দ্রব্যাদি দান করুন এবং আপনার জ্যেষ্ঠাপত্নী সন্ধ্যাবলীই কার্তিক ব্রত পালন করুক।

এইরূপ কথোপকথন চলার সময় পুত্র ধর্মাঙ্গদের একাদশী দিনের ঘোষণা বাদ্য রাজা শুনতে পেলেন। পিতা অবসর-প্রাপ্ত হওয়ায় পুত্র ধর্মাঙ্গদই রাজ্য পরিচালনা করতেন। আগামীকাল একাদশী। তাই বাদ্যধ্বারা প্রজাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তা শুনে রাজা মোহিনীকে বললেন, মোহিনী! তোমার আজ্ঞায় কার্তিক ব্রত পালনে সন্ধ্যাবলীকে নিযুক্ত করেছি, কিন্তু একাদশী ব্রত আমি নিজে করব। তুমিও আমার সাথে সংযতভাবে এই ব্রত পালন কর।

মোহিনী রাজার কথা শুনে বলল—হে রাজন! একাদশী পালন অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আপনি আমার কাছে শপথ করেছেন আমি যা বলব আপনি তা অবশ্যই পালন করবেন। রাজা বললেন—তোমার ইচ্ছা আমি পূরণ করব। মোহিনী বলল—তাহলে আমার ইচ্ছা আপনি একাদশী ব্রত না করে অন্ন ভোজন করুন। যদি আমার কথা রক্ষা না করেন, তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজনিত পাপে ঘোর নরকে পতিত হবেন।

রাজা পুনরায় বললেন—কল্যাণী, আমার ব্রত ভঙ্গ করো না। পরিবর্তে তুমি অন্য যা কিছু চাইবে আমি তা প্রদান করব। একাদশীতে কেউ অন্ন ভোজন করবে না—একথা আমি নিজেই প্রচার করে কিভাবে তার বিপরীত আচরণ করব? যদি ইন্দ্রের তেজ ক্ষীণ হয়, সমুদ্র শুকিয়ে যায়, অগ্নি তার উষ্ণতা ত্যাগ করে তথাপি রাজা রুক্মাঙ্গদ একাদশী ব্রত ভঙ্গ করবে না।

একথা শুনে মোহিনী ক্রোধে জ্বলে উঠল। 'হে রাজন, আমার কথা না মানলে তুমি ধর্মভ্রষ্ট হবে, আমিও পিতার কাছে চলে যাব'—এই বলে মোহিনী গমনোদ্যত হল। রাজপুত্র ধর্মাঙ্গদ এসে তার গতি রোধ করল। মাতা মোহিনীর কাছে সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করল। পিতার কাছে মোহিনীর মনোবাসনা পূর্ণ করতে প্রার্থনা করল। উত্তেজিত হয়ে রাজা রুক্মাঙ্গদ বললেন—মোহিনী মরে যায় যাক, তবু আমি একাদশী ব্রত থেকে বিরত হব না।

ধর্মাঙ্গদ নিজমাতা সন্ধ্যাবলীকে ডেকে এনে মোহিনীকে সান্ত্বনা দিতে অনুরোধ করল। সন্ধ্যাবলীর শত অনুরোধেও মোহিনী শান্ত হল না। সে বলল—রাজা যদি একাদশীতে ভোজন না করেন তবে তার পরিবর্তে নিজ প্রিয় পুত্রের মস্তক ছেদন করে আমাকে প্রদান করুন। মোহিনীর কথা শুনে সন্ধ্যাবলী বললেন—মহারাজ ধর্মহানি থেকে পুত্রের প্রাণনাশ করাই শ্রেয়। পিতার থেকে মাতার স্নেহ শতগুণ বেশি। কিন্তু আজ মাতা হয়েও স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ধর্মহানির আশঙ্কায় ও সত্য পালনের জন্য পুত্রের মমতা ত্যাগ করছি। আপনি স্নেহমমতা ত্যাগ করে পুত্রকে বধ করুন। সেই সময় রাজপুত্র ধর্মাঙ্গদ মোহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—'তুমি আমার বধরূপ বর গ্রহণ কর'। একটি তীক্ষ্ণ তরবারি পিতার হাতে তুলে দিয়ে বললেন—হে পিতা! আপনি বিলম্ব করবেন না, মোহিনীর কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা পালন করুন, আপনার মঙ্গলের জন্য আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

তখন মোহিনী রাজা রুক্মাঙ্গদকে পুনরায় বলল—'একাদশীতে ভোজন কর, পুত্রবধ করতে হবে না, তা না হলে পুত্রবধ করতে হবে।'

সেই সময় অলক্ষিতভাবে ভগবান বিষ্ণু আকাশে আবির্ভূত হলেন। রাজা আনন্দে প্রণাম করে তরবারি গ্রহণ করলেন। পুত্রও আনন্দে ভূতলে মস্তক স্থাপন করলেন। রাজা তরবারি দিয়ে পুত্রকে বধ করতে উদ্যত হলে পর্বতসহ সমগ্র পৃথিবী কেঁপে উঠল, সমুদ্রে জোয়ার এল, পৃথিবীতে উল্কাপাত হতে লাগল। তা দেখে মোহিনী মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তখন ভগবান শ্রীহরি নিজের হাতে সেই তরবারি ধারণ করে বললেন—হে রাজন! আমি তোমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হয়েছি, তুমি স্ত্রী-পুত্রসহ বৈকুণ্ঠধামে চল।' এই বলে ভগবান অন্তর্হিত হলেন।

তাই মানবজীবনে যে কোন পরিস্থিতিতেও কি বালক, কি বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই একাদশী ব্রত পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

গর্গসংহিতায় বর্ণিত একাদশী মাহাত্ম্য

দেবর্ষি নারদ রাজা বহুলাশ্বকে বললেন—হে মিথিলেশ্বর! সর্বপাপহর ও মঙ্গলের আলয় স্বরূপ যজ্ঞসীতা গোপীদের কথা শ্রবণ কর। দক্ষিণ ভারতে উশিনর নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। সেখানে বহু গোধনসম্পন্ন এক গোপ বসবাস করত। একসময় দশ বছর ধরে সেখানে বারিবর্ষণ হয়নি। গোপ তাতে ব্যাকুল হয়ে অনাবৃষ্টির ভয়ে আত্মীয়-পরিজন ও গোধনসহ ব্রজমণ্ডলে আগমন করেন। তারা নন্দরাজের সাহায্যে মনোরম যমুনার নিকটবর্তী বৃন্দাবনে বাস করতেন। গোপের বহু কন্যা ছিল। তাঁরা পূর্বে যজ্ঞসীতা ছিলেন। কন্যাগণের শরীর ছিল দিব্যাতিদিব্য যৌবনসম্পন্না। একদিন পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তাঁরা মোহিত হন। কিভাবে কৃষ্ণকে প্রসন্ন করা যায় তা জানবার জন্য তাঁরা শ্রীরাধার কাছে গমন করেন।

গোপীগণ বললেন—হে বৃষভানুনন্দিনী রাধে, শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করবার কোন শুভ ব্রত বিষয়ে আমাদের উপদেশ কর। দেবতাদেরও দুর্লভ যশোদা নন্দন কৃষ্ণ তোমারই অধীন। হে রাধে! তুমি জগত মোহন মোহিনী ও সর্বশাস্ত্রে সুনিপুণ।

শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বললেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তোমরা পবিত্রা একাদশী ব্রত কর। তার ফলেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের বশীভূত হবেন। গোপীগণ জিজ্ঞাসা করলেন—হে রাধে! বিভিন্ন মাসে একাদশীর নাম কি এবং কিভাবেই বা আমরা এই একাদশী ব্রত পালন করব?

শ্রীরাধা বললেন—বিষ্ণুর দেহ থেকে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষে পবিত্রা একাদশী মুরাসুর বধের জন্য উৎপন্ন হন। সেই সর্বোত্তম একাদশী মাসে মাসে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হয়ে থাকে। তোমাদের মঙ্গলের জন্য ছাব্বিশটি একাদশীর নাম কীর্তন করছি। প্রথমে উৎপন্না, তারপর মোক্ষদা, সফলা, পুত্রদা, ষট্‌তিলা, জয়া ও বিজয়া। এরপর আমলকী,

পাপমোচনী, কামদা, বরুথিনী ও মোহিনী। অবশেষে অপরা, নির্জলা, যোগিনী, শয়ন, কামিকা, পবিত্রা, অন্নদা, পার্শ্ব, পদ্মিনী, পরমা, ইন্দিরা, পাশাঙ্কুশা, রমা, প্রবোধিনী। যে ব্যক্তি এই নাম পাঠ করেন, তিনি সারা বছরের দ্বাদশীর ফল লাভ করেন।

হে ব্রজাঙ্গনাগণ! এখন একাদশীর নিয়ম শ্রবণ কর। দশমীতে ভূমিতে শয়ন, একবার ভোজন ও ইন্দ্রিয় সংযম করবে। একাদশীর দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃস্নান, ধৌতবস্ত্র পরিধান, তিলক আচমন করবে। ভক্তিযুক্তচিত্তে কেশবের পূজা-অর্চনা ও নৈবেদ্য নিবেদন করবে। নীচ ও পাষণ্ডের সংসর্গ ত্যাগ করবে। ব্রতকথা শ্রবণ ও কৃষ্ণগুণগানে রাত্রি জাগরণ করবে। দ্যূতক্রীড়া, তাম্বুল, পরনিন্দা, চৌর্য, হিংসা, ক্রোধ মিথ্যাভাষণ বর্জনীয়। দ্বাদশী দিনে দশমীর নিয়ম পালনীয়।

গোপীগণ বললেন—হে মহাপ্রজ্ঞে! এই ব্রতের কাল ও মাহাত্ম্য আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। শ্রীরাধে বললেন—দশমী যদি পঞ্চান্ন দণ্ড হয়, তবে তার পরের দিনের একাদশী ত্যাগ করে দ্বাদশীতে উপবাস করবে। যদি একাদশী বর্ধমানা হয়, তবে পরদিনেই উপবাস কর্তব্য। দ্বাদশী বর্ধমানা হলে সেদিনই উপবাস করতে হবে।

হে গোপীগণ! সমস্ত যজ্ঞের ফল একাদশী ব্রত পালনেই লাভ হয়ে থাকে। মেরুপর্বততুল্য পাপরাশীও একাদশী প্রভাবে বিনষ্ট হয়। এই ব্রতে সকল তীর্থ ও তপস্যার ফল পাওয়া যায়। পূর্বপুরুষদের কল্যাণসাধন ও শ্রীহরির প্রীতিসাধনে পবিত্রা একাদশীর সমান ব্রত আর জগতে নেই। পূর্বে মেধাবী মুনি, মহারাজ অম্বরীষ আদি বহু ব্যক্তি এই একাদশী ব্রত পালন করে বৈকুণ্ঠ লাভ করেছেন।

নারদ বললেন—হে রাজন্, যজ্ঞাসীতা গোপীগণ শ্রীরাধার মুখে এসব কথা শুনে কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য যথাবিধি একাদশী ব্রত করেন। তাঁদের একাদশী ব্রত ফলে স্বয়ং শ্রীহরি প্রসন্ন হয়ে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় তাঁদের সাথে রাসলীলা করেছিলেন।

বরুথিনী একাদশী

বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষীয়া বরুথিনী একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য ভবিষ্যোত্তর পুরাণে যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে বর্ণনা করা হয়েছে।

যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে বাসুদেব! আপনাকে প্রণাম। বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী কি নামে প্রসিদ্ধ এবং তার মহিমাই বা কি তা কৃপা করে আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজন! ইহলোক ও পরলোকে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী 'বরুথিনী' নামে বিখ্যাত। এই ব্রত পালনে সর্বদা সুখ লাভ হয় এবং পাপক্ষয় ও সৌভাগ্য প্রাপ্তি ঘটে। দুর্ভাগা স্ত্রীলোক এই ব্রত পালনে সর্বসৌভাগ্য লাভ করে থাকে। ভক্তি ও মুক্তি প্রদানকারী এই ব্রত সর্বপাপহরণ এবং গর্ভবাস যন্ত্রণা বিনাশ করে। এই ব্রত প্রভাবে মান্ধাতা, ধুন্ধুমার আদি রাজারা দিব্যধাম লাভ করেছেন। এমনকি মহাদেব শিবও এই ব্রত পালন করেছিলেন। দশ হাজার বৎসর তপস্যার ফল কেবলমাত্র এক বরুথিনী ব্রত পালনে লাভ হয়। যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই ব্রত পালন করেন তিনি ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত প্রকার বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন।

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অশ্বদান অপেক্ষা গজদান শ্রেষ্ঠ, গজদান থেকে ভূমিদান, তা থেকে তিলদান, তিলদান থেকে স্বর্ণদান এবং তা অপেক্ষাও অন্নদান শ্রেষ্ঠ। অন্নদানের মতো শ্রেষ্ঠ দান আর নেই। পিতৃলোক, দেবলোক ও মানুষেরা অন্নদানেই পরিতৃপ্ত হন। পণ্ডিতেরা কন্যাদানকে অন্নদানের সমান বলে থাকেন। স্বয়ং ভগবান গোদানকে অন্নদানের সমান বলেছেন। আবার এই সমস্ত প্রকার দান থেকেও বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই বরুথিনী ব্রত পালনে সেই বিদ্যাদানের সমান ফল লাভ হয়ে থাকে।

পাপমতি যে সব মানুষ কন্যার উপার্জিত অর্থে জীবনধারণ করে, পুণ্যক্ষয়ে তাদের নরকযাতনা ভোগ করতে হয়। তাই কখনও কন্যার

উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি বিত্তির স্বর্ণালঙ্কার সহ কন্যাদান করেন তাঁর পুণ্যের হিসাব স্বয়ং চিত্রগুপ্তও করতে অসমর্থ হন। কিন্তু 'বরুথিনী' ব্রত পালনকারী কন্যাদান থেকেও বেশি ফল লাভ করে।

ব্রতকারী ব্যক্তি দশমীর দিনে কাঁসার পাত্রে ভোজন, মাংস, মসুর, ছোলা, শাক, মধু, অন্যের প্রদত্ত অন্নগ্রহণ, দুইবার আহার ও মৈথুন পরিত্যাগ করবে। দ্যূতক্রীড়া, নেশাজাতীয় দ্রব্য, দিবানিদ্রা, পরনিন্দা-পরচর্চা, প্রতারণা, চুরি, হিংসা, মৈথুন, ক্রোধ ও মিথ্যাবাক্য একাদশীর দিনে বর্জনীয়। কাঁসার পাত্রে ভোজন, মাংস, মসুর, মধু, তেল, মিথ্যাভাষণ, ব্যায়াম, দুইবার আহার ও মৈথুন এসব দ্বাদশীর দিনে পরিত্যাজ্য।

হে রাজন! এই বিধি অনুসারে বরুথিনী ব্রত পালনে সকল প্রকার পাপের বিনাশ এবং অক্ষয়গতি লাভ হয়। যিনি হরিবাসরে রাত্রিজাগরণ করে ভগবান জনার্দনের পূজা করেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে পরমগতি লাভ করেন।

তাই সূর্যপুত্র যমরাজের যাতনা থেকে পরিত্রাণের জন্য পরম যত্নে এই একাদশী ব্রত পালন করা কর্তব্য। বরুথিনী একাদশীর ব্রতকথা শ্রদ্ধাভরে পাঠ বা শ্রবণ করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় এবং সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গতি হয়।

মোহিনী একাদশী

কুর্মপুরাণে বৈশাখ শুক্লপক্ষের 'মোহিনী' একাদশীর ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'হে জনার্দন! বৈশাখ শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম, কি ফল, কি বিধি—এসকল কথা আমার নিকট বর্ণনা করুন।'

উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ধর্মপুত্র! আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন পূর্বে শ্রীরামচন্দ্রও বশিষ্ঠের কাছে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—হে মুনিবর! আমি জনকনন্দিনী সীতার বিরহজনীত কারণে বহু দুঃখ পাচ্ছি। তাই একটি উত্তম ব্রতের কথা আমাকে বলুন। যার দ্বারা সর্বপাপ ক্ষয় ও সর্বদুঃখ বিনষ্ট হয়।

এই কথা শুনে বশিষ্ঠদেব বললেন—হে রামচন্দ্র! তুমি উত্তম প্রশ্ন করেছ। যদিও তোমার নামগ্রহণেই মানুষ পবিত্র হয়ে থাকে। তবুও লোকের মঙ্গলের জন্য তোমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরম পবিত্র একটি ব্রতের কথা বলছি।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী 'মোহিনী' নামে প্রসিদ্ধা। এই ব্রত প্রভাবে মানুষের সকল পাপ, দুঃখ ও মোহজাল অচিরেই বিনষ্ট হয়। তাই মানুষের উচিত সকল পাপক্ষয়কারী ও সর্বদুঃখবিনাশী এই একাদশী ব্রত পালন করা। একাগ্রচিত্তে তার মহিমা তুমি শ্রবণ কর। এই কথা শ্রবণমাত্রেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

পবিত্র সরস্বতী নদীর তীরে ভদ্রাবতী নামে এক সুশোভনা নগরী ছিল। চন্দ্রবংশজাত ধৃতিমান নামে এক রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। সেই নগরীতেই ধনপাল নামে এক বৈশ্য বাস করতেন। তিনি ছিলেন পুণ্যকর্মা ও সমৃদ্ধশালী ব্যক্তি। তিনি নলকূপ, জলাশয়, উদ্যান, মঠ ও গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করে দিতেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ

ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। সুমনা, দ্যুতিমান, মেধাবী, সুকৃতি ও ধৃষ্টবুদ্ধি নামে তার পাঁচজন পুত্র ছিল। পঞ্চম পুত্র ধৃষ্টবুদ্ধি ছিল অতি দুরাচারী। সে সর্বদা পাপকার্যে লিপ্ত থাকত। পরস্ত্রী সঙ্গী, বেশ্যাসক্ত, লম্পট ও দ্যুতক্রীড়া প্রভৃতি পাপে সে অত্যন্ত আসক্ত ছিল। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতামাতার সেবায় তার একেবারেই মতি ছিল না। সে অন্যায়কার্যে রত, দুষ্টস্বভাব ও পিতৃধন ক্ষয়কারক ছিল। সবসময় সে অভক্ষ ভক্ষণ ও সুরাপানে মত্ত থাকত।

পিতা ধনপাল একদিন পথ চলছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ধৃষ্টবুদ্ধি এক বেশ্যার গলায় হাত রেখে নিঃসকোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার নির্লজ্জ পুত্রকে এভাবে চৌরাস্তায় ভ্রমণ করতে দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এই কুস্বভাব দর্শনে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাকে গৃহ থেকে বার করে দিলেন। তার আত্মীয়-স্বজনও তাকে পরিত্যাগ করল। সে তখন নিজের অলংকারাদি বিক্রি করে জীবন অতিবাহিত করত। কিছুদিন এইভাবে চলার পর অর্থাভাব দেখা দিল। ধনহীন দেখে সেই বেশ্যাগণও তাকে পরিত্যাগ করল।

অন্নবস্ত্রহীন ধৃষ্টবুদ্ধি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল। অবশেষে নিজের গ্রামে সে চুরি করতে শুরু করল। একদিন রাজপ্রহরী তাকে ধরে বন্দী করল। কিন্তু পিতার সম্মানার্থে তাকে মুক্ত করে দিল। এভাবে বারকয়েক সে ধরা পড়ল ও ছাড়া পেল। কিন্তু তবুও সে চুরি করা বন্ধ করল না। তখন রাজা তাকে কারাগারে বন্ধ করে রাখলেন। বিচারে সে কষাঘাত দণ্ডভোগ করল। কারাভোগের পর অনন্য উপায় ধৃষ্টবুদ্ধি বনে প্রবেশ করল। সেখানে সে পশুপাখি বধ করে তাদের মাংস ভক্ষণ করে অতি দুঃখে পাপময় জীবন যাপন করতে লাগল।

দুষ্কর্মের ফলে কেউ কখনও সুখী হতে পারে না। তাই সেই ধৃষ্টবুদ্ধি দিবারাত্রি দুঃখশোকে জর্জরিত হল। এভাবে অনেকদিন

অতিবাহিত হল। কোন পুণ্যফলে সহসা একদিন সে কৌণ্ডিন্য ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হল। বৈশাখ মাসে ঋষিবর গঙ্গাস্নান করে আশ্রমের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। শোকাকুল ধৃষ্টবুদ্ধি তার সম্মুখে উপস্থিত হল। ঘটনাক্রমে ঋষির বস্ত্র হতে একবিন্দু জল তার গায়ে পড়ল। সেই জলস্পর্শে তার সমস্ত পাপ দুর হল। হঠাৎ তার শুভবুদ্ধির উদয় হল।

ঋষির সামনে সে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করতে লাগল 'হে ঋষিশ্রেষ্ঠ। যে পুণ্য প্রভাবে আমি এই ভীষণ দুঃখযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারি, তা কৃপাকরে আমাকে বলুন।'

ঋষিবর বললেন—'বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে মোহিনী নামে যে প্রসিদ্ধ একাদশী আছে, তুমি সেই ব্রত পালন কর। এই ব্রতের ফলে মানুষের বহু জন্মার্জিত পর্বত পরিমাণ পাপরাশিও ক্ষয় হয়ে থাকে।

মহামুনি বশিষ্ঠ বললেন—কৌণ্ডিন্য ঋষির উপদেশ শ্রবণ করে প্রসন্ন চিত্তে ধৃষ্টবুদ্ধি সেই ব্রত পালন করল।

হে মহারাজ রামচন্দ্র! এই ব্রত পালনে সে নিষ্পাপ হল। দিব্যদেহ লাভ করল। অবশেষে গরুড়ে আরোহন করে সকল প্রকার উপদ্রবহীন বৈকুণ্ঠধামে গমন করল। হে রাজন, ত্রিলোকে মোহিনী ব্রত থেকে আর শ্রেষ্ঠ ব্রত নেই। যজ্ঞ, তীর্থস্নান, দান ইত্যাদি কোন পুণ্যকর্মই এই ব্রতের সমান নয়। এই ব্রত কথার শ্রবণ কীর্তনে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

অপরা একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে কৃষ্ণ! জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি এবং তার মাহাত্ম্যই বা কি, আমি শুনতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ করে তা বর্ণনা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহারাজ! মানুষের মঙ্গলের জন্য আপনি খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন। বহু পুণ্য প্রদানকারী মহাপাপ বিনাশকারী ও পুত্রদানকারী এই একাদশী 'অপরা' নামে খ্যাত। এই ব্রত পালনকারী ব্যক্তি জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, ভ্রূণহত্যা, পরনিন্দা, পরস্ত্রীগমন, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি গুরুতর পাপ এই ব্রত পালনে নষ্ট হয়ে যায়।

যারা মিথ্যাসাক্ষ্যদান করে, ওজন বিষয়ে ছলনা করে, শাস্ত্রের মিথ্যা ব্যাখ্যা প্রদান করে, জ্যোতিষের মিথ্যা গণনা ও মিথ্যা চিকিৎসায় রত থাকে, তারা সকলেই নরকযাতনা ভোগ করে। এসমস্ত ব্যক্তিরাও যদি এই ব্রত পালন করে, তবে তারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় যদি স্বধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়, তবে সে ঘোরতর নরকগামী হয়। কিন্তু সেও এই ব্রত পালনে মুক্ত হয়ে স্বর্গগতি লাভ করে।

মকররাশিতে সূর্য অবস্থানকালে মাঘ মাসে প্রয়াগ স্নানে যে ফল লাভ হয়; শিবরাত্রিতে কাশীধামে উপবাস করলে যে পুণ্য হয়; গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানে যে ফল পাওয়া যায়; সিংহরাশিতে বৃহস্পতির অবস্থানে গৌতমী নদীতে স্নানে, কুম্ভে কেদারনাথ দর্শনে, বদরিকাশ্রম-যাত্রায় ও বদ্রীনারায়ণ সেবায়; সূর্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে স্নানে, হাতি, ঘোড়া, স্বর্ণ দানে এবং দক্ষিণাসহ যজ্ঞ সম্পাদনে যে ফল লাভ হয়, এই ব্রত পালন করলে অনায়াসে সেই সকল ফল লাভ হয়ে থাকে। এই অপরা ব্রত পাপরূপ বৃক্ষের কুঠার স্বরূপ, পাপরূপ কাষ্ঠের দাবাগ্নির মতো,

পাপরূপ অন্ধকারের সূর্যসদৃশ এবং পাপহস্তির সিংহস্বরূপ। এই ব্রত পালন না করে যে ব্যক্তি জীবন ধারণ করে জলে বুদবুদের মতো তাদের জন্ম-মৃত্যুই কেবল সার হয়। অপরা একাদশীতে উপবাস করে বিষ্ণুপূজা করলে সর্বপাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। এই ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণ করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী

জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষের এই নির্জলা একাদশী ব্রত সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীভীমসেন-ব্যাসসংবাদে বর্ণিত হয়েছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে জনার্দন! আমি অপরা একাদশীর সমস্ত মাহাত্ম্য শ্রবণ করলাম এখন জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম ও মাহাত্ম্য কৃপাপূর্বক আমার কাছে বর্ণনা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এই একাদশীর কথা মহর্ষি ব্যাসদেব বর্ণনা করবেন। কেননা তিনি সর্বশাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব পূর্ণরূপে জানেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে বললেন—হে মহর্ষি দ্বৈপায়ন! আমি মানুষের লৌকিক ধর্ম এবং জ্ঞানকাণ্ডের বিষয়ে অনেক শ্রবণ করেছি। আপনি যথাযথভাবে ভক্তিবিষয়িনী কিছু ধর্মকথা এখন আমায় বর্ণনা করুন।

শ্রীব্যাসদেব বললেন—হে মহারাজ! তুমি যেসব ধর্মকথা শুনেছ এই কলিযুগের মানুষের পক্ষে সে সমস্ত পালন করা অত্যন্ত কঠিন। যা সুখে, সামান্য খরচে, অল্প কষ্টে সম্পাদন করা যায় অথচ মহাফল প্রদান করে এবং সমস্ত শাস্ত্রের সারস্বরূপ সেই ধর্মই কলিযুগে মানুষের পক্ষে করা শ্রেয়। সেই ধর্মকথাই এখন আপনার কাছে বলছি।

উভয় পক্ষের একাদশী দিনে ভোজন না করে উপবাস ব্রত করবে। দ্বাদশী দিনে স্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে নিত্যকৃত্য সমাপনের পর শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করবে। এরপর ব্রাহ্মণদেরকে প্রসাদ ভোজন করাবে। অশৌচাদিতেও এই ব্রত কখনও ত্যাগ করবে না। যে সকল ব্যক্তি স্বর্গে যেতে চায়, তাদের সারা জীবন এই ব্রত পালন করা উচিত। পাপকর্মে রত ও ধর্মহীন ব্যক্তিরাও যদি এই একাদশী দিনে ভোজন না করে, তবে তারা যমযাতনা থেকে রক্ষা পায়।

শ্রীব্যাসদেবের এসব কথা শুনে গদাধর ভীমসেন অশ্বত্থ পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে বলতে লাগলেন—হে মহাবুদ্ধি পিতামহ! মাতা কুন্তী, দ্রৌপদী, ভ্রাতা যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এরা কেউই

একাদশীর দিনে ভোজন করে না। আমাকেও অন্ন গ্রহণ করতে নিষেধ করে। কিন্তু দুঃসহ ক্ষুধাযন্ত্রণার জন্য আমি উপবাস করতে পারি না।

ভীমসেনের এরকম কথায় ব্যাসদেব বলতে লাগলেন—যদি স্বর্গাদি দিব্যধাম লাভে তোমার একান্ত ইচ্ছা থাকে, তবে উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করবে না।

তদুত্তরে ভীমসেন বললেন—আমার নিবেদন এই যে, উপবাস তো দূরের কথা, দিনে একবার ভোজন করে থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ আমার উদরে 'বৃক' নামে অগ্নি রয়েছে। ভোজন না করলে কিছুতেই সে শান্ত হয় না। তাই প্রতিটি একাদশী পালনে আমি একেবারেই অপারগ।

হে মহর্ষি! বছরে একটি মাত্র একাদশী পালন করে যাতে আমি দিব্যধাম লাভ করতে পারি এরকম কোন একাদশীর কথা আমাকে নিশ্চয় করে বলুন।

তখন ব্যাসদেব বললেন—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে জলপান পর্যন্ত না করে সম্পূর্ণ উপবাস থাকবে। তবে আচমনে দোষ হবে না। ঐদিন অন্নাদি গ্রহণ করলে ব্রত ভঙ্গ হয়।

একাদশীর দিন সূর্যোদয় থেকে দ্বাদশীর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জলপান বর্জন করলে অনায়াসে বারোটি একাদশীর ফল লাভ হয়। বছরের অন্যান্য একাদশী পালনে অজান্তে যদি কখনও ব্রতভঙ্গ হয়ে যায়, তা হলে এই একটি মাত্র একাদশী পালনে সেই সব দোষ দূর হয়। দ্বাদশী দিনে ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নানাদিকার্য সমাপ্ত করে শ্রীহরির পূজা করবে। সদাচারী ব্রাহ্মণদের বস্ত্রাদি দানসহ ভোজন করিয়ে আত্মীয়স্বজন সঙ্গে নিজে ভোজন করবে। এরূপ একাদশী ব্রত পালনে যে প্রকার পুণ্য সঞ্চিত হয়, এখন তা শ্রবণ কর।

সারা বছরের সমস্ত একাদশীর ফলই এই একটি মাত্র ব্রত উপবাসে লাভ করা যায়। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে

বলেছেন—'বৈদিক ও লৌকিক সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে যারা একমাত্র আমার শরণাপন্ন হয়ে এই নির্জলা একাদশী ব্রত পালন করে তারা সর্বপাপ মুক্ত হয়।

বিশেষত কলিযুগে ধন-সম্পদ দানের মাধ্যমে সদ্গতি বা স্মার্ত সংস্কারের মাধ্যমেও যথার্থ কল্যাণ লাভ হয় না। কলিযুগে দ্রব্যশুদ্ধি নেই। কলিতে শাস্ত্রোক্ত সংস্কার বিশুদ্ধ হয় না। তাই বৈদিক ধর্ম কখনও সুসম্পন্ন হতে পারে না।

হে ভীমসেন! তোমাকে বহু কথা বলার আর প্রয়োজন কি? তুমি উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করবে না। যদি তাতে অসমর্থ হও তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে অবশ্যই নির্জলা উপবাস করবে। এই একাদশী ব্রত ধনধান্য ও পুন্যদায়িনী। যমদূতগণ এই ব্রত পালনকারীকে মৃত্যুর পরও স্পর্শ করতে পারে না। পক্ষান্তরে বিষ্ণুদূতগণ তাঁকে বিষ্ণুলোকে নিয়ে যান।

শ্রীভীমসেন ঐদিন থেকে নির্জলা একাদশী পালন করতে থাকায় এই একাদশী 'পাণ্ডবা নির্জলা বা ভীমসেনী একাদশী' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। এই নির্জলা একাদশীতে পবিত্র তীর্থে স্নান, দান, জপ, কীর্তন ইত্যাদি যা কিছু মানুষ করে তা অক্ষয় হয়ে যায়। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই একাদশী মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হন।

যোগিনী একাদশী

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদরূপে বর্ণিত আছে।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে বাসুদেব! আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী মাহাত্ম্য কৃপাপূর্বক আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহারাজ! সকল পাপবিনাশিনী ও মুক্তিপ্রদ এই উত্তম ব্রতের কথা বলছি, আপনি শ্রবণ করুন। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী 'যোগিনী' নামে খ্যাত। মহাপাপ নাশকারী এই তিথি ভবসাগরে পতিত মানুষের উদ্ধার লাভের একমাত্র নৌকাস্বরূপ। ব্রত পালনকারীদের পক্ষে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত বলে প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে আপনাকে একটি পবিত্র পৌরাণিক কাহিনী বলছি।

অলকা নগরে শিবভক্ত পরায়ণ কুবের নামে এক রাজা ছিল। তিনি প্রত্যহ শিবপূজা করতেন। তার হেমমালী নামে একজন মালী ছিল। প্রতিদিন শিব পূজার জন্য মানস সরোবর থেকে সে ফুল তুলে যক্ষরাজ কুবেরকে দিত। বিশালাক্ষী নামে হেমমালীর এক পরমা রূপবতী পত্নী ছিল। সে তার সুন্দরী পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিল। একদিন সে তার স্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে পড়ল। রাজভবনে যাওয়ার কথাও ভুলে গেল। বেলা দুই প্রহর অতীত হল। অর্চনের সময় চলে যাচ্ছে দেখে রাজা ক্রুদ্ধ হলেন। মালীর বিলম্বের কারণ অনুসন্ধানে এক দূত প্রেরণ করলেন।

দূত এসে রাজাকে বলল—'সে গৃহে স্ত্রীর সাথে আনন্দে মত্ত।' দূতের কথা শুনে কুবের অত্যন্ত রেগে তখনি মালীকে তার সামনে হাজির করতে আদেশ দিল। এদিকে মালী কুবেরের পূজার সময় অতিবাহিত হয়েছে বুঝতে পেরে অত্যন্ত ভয় পেল। তাই স্নান না করেই সে রাজার কাছে উপস্থিত হল।

তাকে দেখামাত্র রাজা ক্রোধবশে চোখ রাঙিয়ে বললেন—রে পাপিষ্ঠ, দুরাচার! তুই দেবপূজার পুষ্প আনতে অবজ্ঞা করেছিস তাই আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি তুই শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হয়ে যা এবং তোর প্রিয়তমা ভার্যার সাথে তোর চিরবিয়োগ সংগঠিত হোক। রে নীচ, তুই এখনি এই স্থান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধোগতি লাভ কর।

কুবেরের এই অভিশাপে হেমমালী পত্নীর সাথে স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ কুষ্ঠরোগ ভোগ করতে লাগল। রোগের যন্ত্রণায় দিন অথবা রাত্রে কখনই সে সুখ পেত না। এভাবে শীত গ্রীষ্মে প্রচণ্ড বেদনায় বহুকষ্টে সে জীবনযাপন করতে লাগল। কিন্তু দীর্ঘদিন মহাদেবের অর্চনের ফুল সংগ্রহের সুকৃতি ফলে সে শাপগ্রস্ত হয়েও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবের বিস্মরণ কখনও হয়নি।

একদিন হেমমালী ভ্রমণ করতে করতে হিমালয়ে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হল। কুষ্ঠরোগে পীড়িত সপত্নী হেমমালীকে দর্শন করে শ্রীমার্কণ্ডেয় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কার অভিশাপে এইরকম নিন্দনীয় কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়েছ?'

সে উত্তর দিল—'হে মুনিবর! রাজা ধনকুবেরের আমি ভৃত্য ছিলাম। আমার নাম হেমমালী। আমি প্রত্যহ মানস সরোবর থেকে ফুল তুলে শিব পূজার জন্য রাজকে দিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন স্ত্রীর মনোরঞ্জন হেতু কামাসক্ত হওয়ায় সেই ফুল দিতে বিলম্ব হয়। রাজার অভিশাপে এইরকম দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছি। পরোপকারই সাধুগণের স্বাভাবিক কর্ম। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! আমি অত্যন্ত অপরাধী। কৃপা করে আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

তখন দয়ার্দ্র চিত্ত মার্কণ্ডেয় মুনি বললেন—হে মালী! তোমার মঙ্গলের জন্য শুভফল প্রদানকারী এক ব্রতের উপদেশ করছি। তুমি আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের 'যোগিনী' নামক একাদশী ব্রত পালন কর। এই ব্রতের পুণ্য প্রভাবে তুমি অবশ্যই কুষ্ঠব্যাধি থেকে মুক্ত হবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—ঋষির উপদেশ শ্রবণ করে হেমমালী তাকে প্রণাম জানাল। পরে অত্যন্ত আনন্দে ঋষির আদেশমতো নিষ্ঠার সঙ্গে যোগিনী একাদশী ব্রত পালন করল। এইভাবে হেমমালী সমস্ত রোগ থেকে মুক্ত হল ও পত্নীসহ সুখে জীবনযাপন করতে লাগল।

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির। আমি আপনার কাছে এই ব্রত উপবাসের মহিমা কীর্তন করলাম। এই ব্রত পালনে অষ্টাশি হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি এই মহাপাপ বিনাশকারী ও পুন্যফল প্রদায়ী যোগিনী একাদশীর কথা পাঠ এবং শ্রবণ করে সে অচিরেই সর্বপাপ থেকে মুক্ত হবে।

শয়ন একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—'হে কৃষ্ণ! আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি? এর মহিমাই বা কি? তা আমাকে কৃপা করে বলুন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ব্রহ্মা এই একাদশী সম্পর্কে দেবর্ষি নারদকে যা বলেছিলেন আমি সেই আশ্চর্যজনক কথা আপনাকে বলছি। শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে নারদ! এ সংসারে একাদশীর মতো পবিত্র আর কোন ব্রত নেই। সকল পাপ বিনাশের জন্য এই বিষ্ণুব্রত পালন করা একান্ত আবশ্যক। যে ব্যক্তি এই প্রকার পবিত্র পাপনাশক এবং সকল অভিষ্ট প্রদাতা একাদশী ব্রত না করে তাকে নরকগামী হতে হয়।

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের এই একাদশী 'শয়নী' নামে বিখ্যাত। শ্রীভগবান ঋষিকেশের জন্য এই ব্রত পালন করতে হয়। এই ব্রতের সম্বন্ধে এক মঙ্গলময় পৌরাণিক কাহিনী আছে। আমি এখন তা বলছি।

বহু বছর পুর্বে সূর্যবংশে মান্ধাতা নামে একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং প্রতাপশালী চক্রবর্তী রাজা। প্রজাদেরকে তিনি নিজের সন্তানের মতো প্রতিপালন করতেন। সেই রাজ্যে কোনরকম দুঃখ, রোগ-ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, আতঙ্ক, খাদ্যাভাব অথবা কোন অন্যায় আচরণ ছিল না। এইভাবে বহুদিন অতিবাহিত হল। কিন্তু একসময় হঠাৎ দৈবদুর্বিপাকে ক্রমাগত তিনবছর সে রাজ্যে কোন বৃষ্টি হয়নি। দুর্ভিক্ষের ফলে সেখানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে দানমন্ত্রের 'স্বাহা' 'স্বধা' ইত্যাদি শব্দও বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি বেদপাঠও ক্রমশ বন্ধ হল।

তখন প্রজারা রাজার কাছে এসে বলতে লাগল—মহারাজ দয়া করে আমাদের কথা শুনুন। শাস্ত্রে জলকে নার বলা হয় আর সেই জলে ভগবানের অয়ন অর্থাৎ নিবাস। তাই ভগবানের এক নাম নারায়ণ।

মেঘরূপে ভগবান বিষ্ণু সর্বত্র বারিবর্ষণ করেন। সেই বৃষ্টি থেকে অন্ন এবং অন্ন খেয়ে প্রজাগণ জীবন ধারণ করেন। এখন সেই অন্নের অভাবে প্রজারা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। অতএব হে মহারাজ আপনি এমন কোন উপায় অবলম্বন করুন যাতে আপনার রাজ্যের শান্তি এবং কল্যাণ সাধন হয়।

রাজা মান্ধাতা বললেন—তোমরা ঠিকই বলেছ। অন্ন থেকে প্রজার উদ্ভব। অন্ন থেকেই প্রজার পালন। তাই অন্নের অভাবে প্রজারা বিনষ্ট হয়। আবার রাজার দোষেও রাজ্য নষ্ট হয়। আমি নিজের বুদ্ধিতে আমার নিজের কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না। তবুও প্রজাদের কল্যাণের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।

তারপর রাজা ব্রহ্মাকে প্রণাম করে সৈন্যসহ বনে গমন করলেন। সেখানে প্রধান প্রধান ঋষিদের আশ্রমে ভ্রমণ করলেন। এভাবে একদিন তিনি ব্রহ্মার পুত্র মহাতেজস্বী অঙ্গিরা ঋষির সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তাকে দর্শনমাত্রই রাজা মহানন্দে ঋষির চরণ বন্দনা করলেন। মুনিবর তাকে আশীর্বাদ ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা তখন তার বনে আগমনের কারণ সবিস্তারে ঋষির কাছে জানালেন।

ঋষি অঙ্গিরা কিছু সময় ধ্যানস্থ থাকার পর বলতে লাগলেন—'হে রাজন! এটি সত্যযুগ। এই যুগে সকল লোক বেদপরায়ণ এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ তপস্যা করে না। এই নিয়ম থাকা সত্ত্বেও এক শূদ্র এ রাজ্যে তপস্যা করছে। তার এই অকার্যের জন্যই রাজ্যের এই দুর্দশা। তাই তাকে হত্যা করলেই সকল দোষ দূর হবে।

রাজা বললেন—হে মুনিবর! তপস্যাকারী নিরপরাধ ব্যক্তিকে আমি কিভাবে বধ করব? আমার পক্ষে সহজসাধ্য অন্য কোন উপায় থাকলে আপনি তা দয়া করে আমাকে বলুন।

তদুত্তরে মহর্ষি অঙ্গিরা বললেন—আপনি আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের শয়নী নামে প্রসিদ্ধা একাদশী ব্রত পালন করুন। এই ব্রতের প্রভাবে

নিশ্চয়ই রাজ্যে বৃষ্টি হবে। এই একাদশী সর্বসিদ্ধি দাত্রী এবং সর্ব উপদ্রব নাশকারিনী। হে রাজন! প্রজা ও পরিবারবর্গ সহ আপনি এই ব্রত পালন করুন।

মুনিবরের কথা শুনে রাজা নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন। আষাঢ় মাস উপস্থিত হলে রাজ্যের সকল প্রজা রাজার সাথে এই একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। ব্রত প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। কিছুকালের মধ্যেই অন্নাভাব দুর হল। ভগবান হৃষিকেশের কৃপায় প্রজাগণ সুখী হল।

এ কারণে সুখ ও মুক্তি প্রদানকারী এই উত্তম ব্রত পালন করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। ভবিষোত্তরপুরাণে যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ তথা নারদ-ব্রহ্মা সংবাদ রূপে একাদশীর এই মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

কামিকা একাদশী

শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষীয়া কামিকা একাদশীর কথা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদে বলা হয়েছে।

যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে গোবিন্দ! হে বাসুদেব! শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম এবং মাহাত্ম্য সবিস্তারে আমার কাছে বর্ণনা করুন। তা শুনতে আমি অত্যন্ত কৌতুহলী।

প্রত্যুত্তরে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজন! পূর্বে দেবর্ষি নারদ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে এই প্রশ্ন করলে তিনি যে উত্তর প্রদান করেছিলেন আমি এখন সেই কথাই বলছি। আপনি মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন।

একসময় ব্রহ্মার কাছে ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ জিজ্ঞাসা করলেন—হে ভগবান! শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম কি, এর আরাধ্য দেবতা কে, সেই ব্রতের বিধিই বা কিরকম এবং এই ব্রতের ফলে কি পুণ্য লাভ হয় তা সবিশেষ জানতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপা করে আমাকে তা জানালে আমার জীবন ধন্য হবে।

শ্রীনারদের কথা শুনে ব্রহ্মা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন—হে বৎস! জগৎ জীবের মঙ্গলের জন্য আমি তোমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিচ্ছি, তুমি তা শ্রবণ কর।

শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী 'কামিকা' নামে জগতে প্রসিদ্ধা। এই একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ভগবান শ্রীহরির পূজা-অর্চনা অপরিমিত পূর্ণ ফল প্রদান করে। গঙ্গা গোদাবরী কাশী নৈমিষারণ্য পুষ্কর ইত্যাদি তীর্থ দর্শনের সমস্ত ফল একমাত্র কৃষ্ণপূজার মাধ্যমে কোটিগুণ লাভ করা যায়।

সাগর ও অরণ্য যুক্ত পৃথিবী দানের ফল, দুগ্ধবতী গাভী দানের ফল অনায়াসে এই ব্রত পালনে লাভ হয়। যারা পাপপূর্ণ সাগরে নিমগ্ন এই ব্রতই তাদের উদ্ধারের একমাত্র সহজ উপায়। এইরকম পবিত্র

পাপনাশক শ্রেষ্ঠ ব্রত আর জগতে নেই। শ্রীহরি স্বয়ং এই মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। রাত্রি জাগরণ করে যারা এই ব্রত পালন করেন তাঁরা কখনও দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হন না। এই ব্রত পালনকারী কখনও নিম্নযোনি প্রাপ্ত হন না।

কেশবপ্রিয়া তুলসীপত্রে যিনি শ্রীহরির পূজা করেন পদ্মপাতায় জলের মতো তিনি পাপে নির্লিপ্ত থাকেন। তুলসীপত্র দিয়ে বিষ্ণুপূজায় ভগবান যেমন সন্তুষ্ট হন, মণিমুক্তাদি মূল্যবান রত্ন মাধ্যমেও তেমন প্রীত হন না। যিনি কেশবকে তুলসীমঞ্জরী দিয়ে পূজা করেন তার জন্মার্জিত সমস্ত পাপক্ষয় হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বললেন—হে নারদ! যিনি তুলসীকে প্রত্যহ দর্শন করেন তার সকল পাপরাশি বিদূরিত হয়ে যায়, যিনি তাঁকে স্পর্শ করেন তার পাপমলিন দেহ পবিত্র হয়, তাঁকে প্রণাম করলে সমস্ত রোগ দূর হয়, তাঁকে জল সিঞ্চন করলে যমও তার কাছে আসতে ভয় পান। শ্রীহরিচরণে তুলসী অর্পিত হলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। তাই হে কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী তোমায় প্রণাম করি।

যে ব্যক্তি হরিবাসরে ভগবানের সামনে দীপদান করেন চিত্রগুপ্তও তাঁর পুণ্যের সংখ্যা হিসাব করতে পারে না। তার পিতৃপুরুষেরাও পরম তৃপ্তি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজন! আমি আপনার কাছে সর্বপাপহারিনী 'কামিকা' একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করলাম। অতএব যিনি ব্রহ্মহত্যা ভ্রূণহত্যা-পাপবিনাশিনী, মহাপুণ্যফলদায়ী এই ব্রত পালন করবেন ও এই মাহাত্ম্য শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ অথবা শ্রবণ করবেন তিনি সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করবেন।

পবিত্রারোপণী একাদশী

একদিন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে প্রভু! শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি তা কৃপা করে আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহারাজ! এখন আমি সেই পবিত্র ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি, মনোযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করুন। যা শোনামাত্রেই বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

প্রাচীন কালে দ্বাপর যুগের শুরুতে মহিজীৎ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি মাহিস্মতি নগরে রাজত্ব করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তার মনে বিন্দুমাত্র সুখ-শান্তি ছিল না। কেননা তিনি ছিলেন অপুত্রক। 'পুত্রহীনের ইহলোক পরলোক কোথাও সুখ হয় না'—এইরূপ চিন্তা করতে করতে বহুদিন কেটে গেল। কিন্তু তবুও পুত্রমুখ দর্শনে রাজা বঞ্চিতই রইলেন। নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা মনে করে রাজা চিন্তাগ্রস্ত হলেন। প্রজাদের সামনে গিয়ে বলতে লাগলেন—হে প্রজাবৃন্দ! তোমরা শোন। আমি এই জন্মে তো কোন পাপকাজ করিনি, অন্যায়ভাবে আমার রাজকোষ বৃদ্ধি করিনি, ব্রাহ্মণ বা দেবতাদের সম্পদ কখনও গ্রহণ করিনি উপরন্তু প্রজাদেরকে পুত্রের মতো পালন করেছি, ধর্ম অনুযায়ী পৃথিবী শাসন করেছি। দুষ্টদের যথানুরূপ দণ্ড দিয়েছি, সজ্জন ব্যক্তিদের যথাযোগ্য সম্মান করতেও কখনও অবহেলা করিনি। তাই হে ব্রাহ্মণগণ, এই প্রকার ধর্মপথ অবলম্বন করা সত্ত্বেও কেন আমার পুত্র লাভ হল না, তা আপনারা কৃপা করে অনুসন্ধান করুন।

রাজার এই প্রকার কাতর উক্তি শ্রবণে ব্যথিত রাজভক্ত পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ রাজার মঙ্গলের জন্য গভীর বনে ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষির কাছে যেতে মনস্থ করলেন। বনের মধ্যে ঋষিদের আশ্রমসকল দেখতে দেখতে তারা এক মুনির সন্ধান পেলেন। তিনি দীর্ঘায়ু, নীরোগ,

নিরাহারে ঘোর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। সর্বশাস্ত্র বিশারদ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ সেই মহামুনি লোমশ নামে পরিচিত। ব্রহ্মার এক কল্প অতিবাহিত হলে মুনিবরের গায়ের একটি লোম পরিত্যক্ত হোত। এই কারণে এই মহামুনির নাম লোমশ। তাকে দেখে সকলেই ধন্য হলেন। তারা পরস্পর বলতে লাগলেন যে, আমাদের বহু জন্মের সৌভাগ্যের ফলে আজ আমরা এই মুনিবরের সাক্ষাৎ লাভ করলাম। তারপর ঋষিবর তাদের সম্বোধন করে বললেন—কি কারণে আপনারা এখানে এসেছেন এবং কেনই বা আমার এত প্রশংসা করছেন, তা স্পষ্ট করে বলুন। আপনাদের যাতে মঙ্গল হয়, আমি নিশ্চয়ই তার চেষ্টা করব।

ব্রাহ্মণেরা বললেন—হে ঋষিবর! আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি আপনি তা কৃপা করে শুনুন। এ পৃথিবীতে আপনার মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর কোথাও নেই। মহীজিৎ নামে এক রাজা নিঃসন্তান হওয়ায় অতি দুঃখে দিনযাপন করছে। আমরা তার প্রজা, তিনি আমাদেরকে পুত্রের মতো পালন করেন। কিন্তু তিনি পুত্রহীন বলে আমরাও সবাই মর্মাহত। তার দুঃখ দূর করতে আমরা এই বনে প্রবেশ করেছি। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! রাজা যাতে পুত্রের মুখ দর্শন করতে পারেন, কৃপা করে তার কোন উপায় আমাদের বলুন।

তাদের কথা শুনে মুনিবর ধ্যানমগ্ন হলেন। কিছু সময় পরে রাজার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। এই রাজা পূর্বজন্মে এক দরিদ্র বৈশ্য ছিলেন। একবার তিনি একটি অন্যায় কার্য করে ফেলেন। ব্যবসা করবার জন্য তিনি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করতেন। এক সময় জৈষ্ঠ্য মাসে শুক্লপক্ষের দশমীর দিনে কোথাও যাওয়ার পথে তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। গ্রাম প্রান্তে একটি জলাশয় তিনি দেখতে পান। সেখানে জলপানের জন্য যান। একটি গাভী ও তার বাছুর সেখানে জলপান করছিল। তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি নিজেই জলপান করতে লাগলেন। এই পাপকর্মের ফলে তিনি

পুত্রসুখে বঞ্চিত হয়েছেন। কিন্তু পূর্বজন্মের কোন পুণ্যের ফলে তিনি এইরকম নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করেছেন।

হে মুনিবর! শাস্ত্রে আছে যে পুণ্য দ্বারা পাপক্ষয় হয়। তাই আপনি এমন একটি পুণ্যব্রতের উপদেশ করুন যাতে তার পারব্ধ পাপ দূর হয় এবং আপনার অনুগ্রহে তিনি পুত্রসন্তান লাভ করতে পারেন।

লোমশ মুনি বললেন—শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের পবিত্রারোপণী একাদশী ব্রত অভিষ্ট ফল প্রদান করে। আপনারা যথাবিধি তা সকলে পালন করুন।

লোমশ মুনির উপদেশ শুনে আনন্দ চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা রাজাকে সে সকল কথা জানালেন। তারপর সকলে মিলে মুনির নির্দেশ অনুসারে ব্রত পালন করলেন। তাদের সকলের পুণ্যফল রাজাকে প্রদান করলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে রাজমহিষী গর্ভবতী হলেন। উপযুক্ত সময়ে বলিষ্ঠ, সর্বাঙ্গসুন্দর এক পুত্রসন্তানের জন্ম দান করলেন।

ভবিষ্যোত্তরপুরাণে এই মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এই ব্রত মাহাত্ম্য যিনি পাঠ বা শ্রবণ করবেন তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন এবং পুত্রসুখ ভোগ করে অবশেষে দিব্যধাম প্রাপ্ত হবেন।

অন্নদা একাদশী

এই ভাদ্রবতী কৃষ্ণপক্ষীয়া অন্নদা একাদশীর মাহাত্ম্য ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে কৃষ্ণ! ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম কি, তা শুনতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজন! আমি সবিস্তারে এই একাদশীর কথা বর্ণনা করছি। আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন।

ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীকে বলা হয় 'অন্নদা'। এই তিথি সর্বপাপবিনাশিনী। যিনি শ্রীহরির অর্চনে এই ব্রত পালন করেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হন। এমনকি এই ব্রতের নাম শ্রবণেই রাশি রাশি পাপ বিদূরিত হয়ে যায়। এই ব্রত প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক ইতিহাস রয়েছে।

প্রাচীন কালে হরিশ্চন্দ্র নামে এক নিষ্ঠাপরায়ণ সত্যবাদী, চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। পূর্ব কর্মফল ও প্রতিজ্ঞার সত্যতা রক্ষায় তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হন। অবস্থা এমন হল যে, তিনি নিজের স্ত্রী-পুত্র এবং অবশেষে নিজেকেও পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হলেন।

হে রাজেন্দ্র! এই পুণ্যবান রাজা চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করেও সত্যরক্ষার্থে দৃঢ়নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি শ্মশানে মৃতব্যক্তির বস্ত্রও কর রূপে গ্রহণ করতেন। এইভাবে তাঁর বহু বছর কেটে গেল।

দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়ে 'কি করি, কোথায় যাই, কিভাবে এ দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাই'—এই চিন্তায় তিনি দিনরাত্রি বিভোর হলেন। এমন সময় দৈবক্রমে পরদুঃখদুঃখী গৌতম ঋষি রাজার কাছে এলেন। রাজা মুনিকে দর্শন করে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। করযোড়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একে একে নিজের সমস্ত কথা জানালেন। রাজার দুঃখের কথা শুনে মুনিবর বিস্ময়াপন্ন হলেন।

অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে তিনি বললেন—'হে রাজন! ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের একদশী অন্নদা নামে জগতে প্রসিদ্ধ। আপনি এই ব্রত

পালন করুন। এই ব্রতপ্রভাবে আপনার সমস্ত পাপের বিনাশ হবে। আপনার ভাগ্যবশত আগামী সাত দিন পরেই এই তিথির আবির্ভাব হবে। ঐ দিন উপবাস থেকে রাত্রি জাগরণ করবেন। এইভাবে ব্রত উদযাপনে আপনার সমস্ত পাপক্ষয় হবে। হে রাজন! আপনার পুণ্যপ্রভাবে আমি এখানে এসেছি জানবেন। এইকথা বলে গৌতম মুনি অন্তর্হিত হলেন।

ঋষিবরের উপদেশ মতো তিনি শ্রদ্ধা সহকারে সেই ব্রত পালন করলেন। তার ফলে তাঁর সমস্ত পাপ দূর হল। হে মহারাজ! এই ব্রতের প্রভাব শ্রবণ করুন। যথাবিধি এই ব্রত পালনে বহু বছরের দুঃখভোগের অবসান হয়। ব্রতের প্রভাবে রাজা হরিশচন্দ্রের সকল দুঃখ সমাপ্ত হল। পুনরায় তিনি স্ত্রীকে ফিরে পেলেন এবং তাঁর মৃতপুত্রও জীবিত হল। আকাশ থেকে দেবগণ দুন্দুভিবাদ্য ও পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। নিষ্কণ্টক রাজ্যসুখ ভোগ করে অবশেষে আত্মীয়-স্বজন ও নগরবাসী সহ স্বর্গে গমন করলেন।

যে মানুষ নিষ্ঠা সহকারে এই ব্রত পালন করেন, তিনি শ্রীহরি চরণে ভক্তি লাভ করে অবশেষে দিব্যধামে গমন করেন। এই ব্রতের মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

পার্শ্ব (পরিবর্তিনী) একাদশী

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের পার্শ্ব একাদশী মাহাত্ম্য যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে এইরকম বলা হয়েছে।

যুধিষ্ঠি মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—হে কৃষ্ণ! ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি? এই ব্রত পালনের বিধি কি এবং ব্রত পালনেই বা কি পুণ্য লাভ হয়?

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ধর্মরাজ! মহাপুণ্যপ্রদা, সমস্ত পাপহারিনী এবং মুক্তিদায়িনী এই একাদশী বাজপেয় যজ্ঞ থেকেও বেশি ফল দান করে। যে ব্যক্তি এই তিথিতে ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীবামনদেবের পূজা করেন, তিনি ত্রিলোকে পূজিত হন। পদ্মফুলে পদ্মলোচন শ্রীবিষ্ণুর অর্চনকারী বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। শায়িত ভগবান এই তিথিতে পার্শ্ব পরিবর্তন করেন। তাই এর নাম পার্শ্ব একাদশী বা পরিবর্তিনী একাদশী।

যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন—হে জনার্দন! আপনার এসকল কথা শুনেও আমার সন্দেহ পূর্ণরূপে দূর হয়নি। হে দেব! আপনি কিভাবে শয়ন করেন, কিভাবেই বা পার্শ্ব পরিবর্তন করেন, আর চার্তুমাস্য ব্রত পালনকারীর কি কর্তব্য এবং আপনার শয়নকালে লোকের কি করণীয়? এসব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাকে বলুন। আর কেনই বা দৈত্যরাজ বলিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তা বর্ণনা করে আমার সকল সন্দেহ দূর করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজন! দৈত্যকুলে আবির্ভূত প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র 'বলি' আমার অতি প্রিয় ভক্ত ছিল। সে আমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য গো-ব্রাহ্মণ পূজা ও যজ্ঞাদি ব্রত সম্পাদন করত। কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষবশত সকল দেবলোক সে জয় করে নেয়। তখন দেবতাগণসহ ইন্দ্র আমার শরণাপন্ন হয়েছিল। তাদের প্রার্থনায় আমি ব্রাহ্মণবালক বেশে বামনরূপে বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত

হলাম। তার কাছে আমি ত্রিপাদভূমিমাত্র প্রার্থনা করেছিলাম। সেই তুচ্ছবস্তু থেকে আরও শ্রেষ্ঠ কিছু সে আমাকে দিতে চাইলেও আমি কেবল ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণেই স্থির থাকলাম। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য আমাকে ভগবানরূপে জানতে পেরে বলিমহারাজকে ঐ দান দিতে নিষেধ করল। কিন্তু সত্যাশ্রয়ী বলি গুরুর নির্দেশ অমান্য করে আমাকে দান দিতে সংকল্প করল। তখন আমি এক পদে নীচের সপ্তলোক, আরেক পদে উপরের সপ্তভুবন অধিকার করে নিলাম। পুনরায় তৃতীয় পদের স্থান চাইলে সে তার মাথা পেতে দিল। আমি তার মস্তকে তৃতীয় পদ স্থাপন করলাম। তার আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে আমি সর্বদা তার কাছে বাস করার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

ভাদ্র শুক্লপক্ষীয়া একাদশীতে ভগবান শ্রীবামনদেবের এক মূর্তি বলি মহারাজের আশ্রমে স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় মূর্তি ক্ষীর সাগরে অনন্তদেবের কোলে শয়ন একাদশী থেকে উত্থান একাদশী পর্যন্ত চারমাস শয়ন অবস্থায় থাকেন। এই চারমাস যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট নিয়ম, ব্রত বা জপ-তপ ব্যতীত দিনযাপন করে, সেই মহামূর্খ জীবিত থাকলেও তাকে মৃত বলে জানতে হবে।

শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দই, আশ্বিনে দুধ, কার্তিক মাসে মাসকলাই বর্জন করে এই চারমাস শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে হয়। প্রতিটি একাদশী ব্রত যথাযথ পালন করতে হয়। শায়িত ভগবান পার্শ্ব পরিবর্তন করেন বলে এই একাদশী মহাপুণ্য ও সকল অভীষ্ট প্রদাতা। এই একাদশী ব্রত পালনে এক সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

ইন্দিরা একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে মধুসূদন! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম তা কৃপা করে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজন! আশ্বিন মাসের একাদশী 'ইন্দিরা' নামে পরিচিত। এই ব্রত প্রভাবে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। এমনকি কর্মবিপাকে যারা নিম্নযোনি লাভ করেছেন, সেই পূর্বপুরুষদেরও উত্তম গতি লাভ হয়। এই একাদশীর মাহাত্ম্য শোনামাত্রই সামবেদীয় যজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হে রাজন! মাহিষ্মতি নগরে ইন্দ্রসেন নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ধর্মবিধি অনুসারে রাজ্য পালনে তিনি বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তার বিপুল ধনসম্পত্তি ছিল। পুত্র-পৌত্রাদিসহ তিনি সুখে রাজ্য পরিচালনা করতেন। বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ সেই রাজা নিরন্তর শ্রীগোবিন্দ নামগানে মগ্ন থাকতেন।

একদিন রাজা সুখে রাজসভায় বসে আছেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ স্বর্গ থেকে সেখানে এলেন। তাঁকে দর্শন করে রাজা হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করে মুনিকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য আদি ষোড়শোপচারে পূজা নিবেদন করলেন। তারপর বললেন—হে মুনিবর! আপনার দর্শনমাত্র আমার যাবতীয় যজ্ঞফল লাভ হয়েছে। এখন আপনার আগমনের কারণ জানিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন।

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে মহারাজ! অতি বিস্ময়কর এক কথা শ্রবণ করুন। আমি একসময় যমলোকে গিয়েছিলাম। সেখানে যমরাজের সভায় বহু পুণ্যকারী আপনার পিতাকে দেখলাম। ব্রতভঙ্গ পাপে তাকে সেখানে যেতে হয়েছে। হে রাজন! আপনার পিতা যে সংবাদ প্রেরণ করেছেন, আমি এখন তা আপনাকে বলছি।

তিনি বললেন—'হে ঋষিবর! মাহিষ্মতির ইন্দ্রসেন রাজা আমার পুত্র। তাকে বলবেন যে, আমি বহু পুণ্য অনুষ্ঠান করলেও কোন

কারণবশত যমালয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনি কৃপা করে তাকে সর্বপাপনাশক ইন্দিরা একাদশী ব্রত পালন করতে বলবেন। সেই ব্রত প্রভাবে আমি নিষ্পাপ হয়ে স্বর্গলোকে যেতে সমর্থ হব।' এই কথা জানাবার জন্যই আমার আগমন। হে রাজন! আপনার পিতার মঙ্গলবিধানে আপনি যথাবিধি ইন্দিরা ব্রত পালন করুন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—হে দেবর্ষি! সেই ইন্দিরা ব্রতের বিধি কি, কোন তিথি বা কোন পক্ষে এই একাদশী ব্রত করা কর্তব্য, তা কৃপা করে আমাকে বলুন।

দেবর্ষি উত্তর দিলেন—হে মহারাজ! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে দশমীর দিন শ্রদ্ধাসহকারে প্রাতঃস্নান করবেন, মধ্যাহ্নে ভক্তিভাবাপন্ন হয়ে পুনরায় স্নান করবেন এবং রাত্রিকালে ভূমিতে শয়ন করবেন। পরদিন একাদশীতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে নিরাহারে থাকবেন। ব্রতের নিয়মাবলী দৃঢ়ভাবে পালন করবেন। 'হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে অচ্যুত! এ শরণাগতের প্রতি কৃপা করুন'। এভাবে শ্রদ্ধা সহকারে শালগ্রাম পূজা করে পিতার উদ্দেশ্যে ব্রতের ফল অর্পণ করবেন। দ্বাদশীর দিন সকালে ভক্তিভরে শ্রীগোবিন্দের পূজা করে ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে অবশেষে নিজে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবেন। হে রাজন! বিধি অনুসারে শ্রীহরি এবং ভক্তদের অর্চন করলে আপনার পিতৃবর্গ মুক্তিলাভ করে শীঘ্রই বৈকুণ্ঠে গমন করবেন।

রাজাকে এই উপদেশ দিয়ে দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করলেন। রাজা ইন্দ্রসেন মুনিবরের উপদেশ অনুসারে পুত্রপরিজনসহ ভক্তিসহকারে এই ইন্দিরা ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। তখন দেবলোক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল এবং তার পিতাও বিষ্ণুলোকে গমন করলেন। তারপর রাজা ইন্দ্রসেন নিজপুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে নিজেও বিষ্ণুলোকে ফিরে গেলেন। এই ইন্দিরা একাদশীর মাহাত্ম্য পাঠে ও শ্রবণে মানুষ সকল পাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।

পাশাঙ্কুশা (পাপাঙ্কুশা) একাদশী

আশ্বিন শুক্লাপক্ষীয়া পাশাঙ্কুশা একাদশী মাহাত্ম্য ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বর্ণিত আছে। যুধিষ্ঠির বললেন—হে মধুসূদন! আশ্বিন শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি?

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজেন্দ্র! আশ্বিনের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী 'পাশাঙ্কুশা' নামে প্রসিদ্ধা। কেউ কেউ একে পাপাঙ্কুশাও বলে থাকেন। এই একাদশীতে অভিষ্ট ফল লাভের জন্য মুক্তিদাতা পদ্মনাভের পূজা করবে। শ্রীহরির নাম-সংকীর্তন দ্বারা পৃথিবীর সর্ব তীর্থের ফল লাভ হয়। বদ্ধ জীব মোহবশত বহু পাপকর্ম করেও ভগবান শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়ে প্রণাম নিবেদনে নরকযাতনা থেকে রক্ষা পায়। এই একাদশীর মহিমা শোনার ফলে নিদারুণ যমদণ্ড থেকে মুক্তি লাভ হয়। শ্রীহরিবাসর ব্রতের মতো ত্রিভুবনে পবিত্রকারী আর কোন বস্তু নেই। হাজার হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং শত শত রাজসূয় যজ্ঞ এই ব্রতের শতভাগের একাংশের সমান হয় না। এই ব্রত পালনে স্বর্গবাস হয়। মুক্তি, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য, সুপত্নী, বন্ধু প্রভৃতি অনায়াসে লাভ করা যায়।

হে রাজন! গয়া, কাশী এমনকি কুরুক্ষেত্রও শ্রীহরিবাসর অপেক্ষা পুণ্যস্থান নয়। হে ভূপাল! একাদশী উপবাস ব্রত করে রাত্রি জাগরণ করলে অনায়াসে বিষ্ণুলোকে গতি হয়। এই পাশাঙ্কুশা ব্রতের ফলে মানুষ সর্বপাপ মুক্ত হয়ে গোলোকে গমন করতে সমর্থ হয়।

এই পবিত্র দিনে যিনি স্বর্ণ, তিল, গাভী, অন্ন, বস্ত্র, জল, ছত্র, পাদুকা দান করেন, তাঁকে আর যমালয়ে যেতে হয় না। যারা এসকল পুণ্যকার্য করে না, তাদের জীবন কামারশালার হাপরের মতো বিফল। নিষ্ঠার সাথে এই ব্রত পালনে উচ্চকুলে নিরোগ ও দীর্ঘায়ু শরীর লাভ হয়। অত্যন্ত পাপাচারীও যদি এই পুণ্যব্রতের অনুষ্ঠান করে তবে সেও রৌরব নামক মহাযন্ত্রনা থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠসুখ লাভ করে। কৃষ্ণভক্তি লাভই শ্রীএকাদশী ব্রতের মুখ্য ফল। তবে আনুষাঙ্গিকরূপে স্বর্গ, ঐশ্বর্যাদি অনিত্য ফল লাভ হয়ে থাকে।

রমা একাদশী

একসময় যুধিষ্ঠির মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে জনার্দন! কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম ও মাহাত্ম্য কৃপা করে আমায় বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজন! মহাপাপ দূরকারী সেই একাদশী 'রমা' নামে বিখ্যাত। আমি এখন এর মাহাত্ম্য বর্ণনা করছি, আপনি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

পুরাকালে মুচুকুন্দ নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ ও ধনপতি কুবেরের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। ভক্তশ্রেষ্ঠ বিভীষণের সাথেও তার অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল। তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। এইরূপে তিনি ধর্ম অনুসারে রাজ্যশাসন করতেন।

চন্দ্রভাগা নামে তার একটি কন্যা ছিল। চন্দসেনের পুত্র শোভনের সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। শোভন একসময় শ্বশুর বাড়িতে এসেছিল। দৈবক্রমে সেইদিন ছিল একাদশী তিথি। স্বামীকে দেখে পতিপরায়ণা চন্দ্রভাগা মনে মনে চিন্তা করতে লাগল—হে ভগবান! আমার স্বামী অত্যন্ত দুর্বল, তিনি ক্ষুধা সহ্য করতে পারেন না। এখানে আমার পিতার শাসন খুবই কঠোর। দশমীর দিন তিনি নাগরা বাজিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, একাদশী দিনে আহার নিষিদ্ধ। আমি এখন কি করি!

রাজার নিষেধাজ্ঞা শুনে শোভন তার প্রিয়তমা পত্নীকে বলল—হে প্রিয়ে, এখন আমার কি কর্তব্য, তা আমাকে বলো। উত্তরে রাজকন্যা বলল—হে স্বামী, আজ এই গৃহে এমনকি রাজ্যমধ্যে কেউই আহার করবে না। মানুষের কথা তো দূরে থাকুক পশুরা পর্যন্ত অন্নজল মাত্র গ্রহণ করবে না। হে নাথ, যদি তুমি এ থেকে পরিত্রাণ চাও তবে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন কর। এখানে আহার করলে তুমি সকলের নিন্দাভাজন হবে এবং আমার পিতাও ক্রুদ্ধ হবেন। এখন বিশেষভাবে বিচার করে যা ভাল হয়, তুমি তাই কর।

সাধ্বী স্ত্রীর এই কথা শুনে শোভন বলল—হে প্রিয়ে! তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমি গৃহে যাব না। এখানে থেকে একাদশী ব্রত পালন করব। ভাগ্যে যা লেখা আছে তা অবশ্যই ঘটবে।

এইভাবে শোভন ব্রত পালনে বদ্ধপরিকর হলেন। সমস্ত দিন অতিক্রান্ত হয়ে রাত্রি শুরু হল। বৈষ্ণবদের কাছে সেই রাত্রি সতিই আনন্দকর। কিন্তু শোভনের পক্ষে তা ছিল বড়ই দুঃখদায়ক। কেননা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ল। এভাবে রাত্রি অতিবাহিত হলে সূর্যোদয়কালে তার মৃত্যু হল। রাজা মুচুকুন্দ সাড়ম্বরে তার শবদাহকার্য সুসম্পন্ন করলেন। চন্দ্রভাগা স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করে পিতার আদেশে পিতৃগৃহেই বাস করতে লাগল।

কালক্রমে রমাব্রত প্রভাবে শোভন মন্দরাচল শিখরে অনুপম সৌন্দর্যবিশিষ্ট এক রমণীয় দেবপুরী প্রাপ্ত হলেন। একসময় মুচুকুন্দপুরের সোমশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ তীর্থভ্রমণ করতে করতে সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে রত্নমণ্ডিত বিচিত্র স্ফটিকখচিত সিংহাসনে রত্নালঙ্কারে ভূষিত রাজা শোভনকে তিনি দেখতে পেলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ দ্বারা নানা উপচারে সেখানে তিনি পূজিত হচ্ছিলেন। রাজা মুচুকুন্দের জামাতারূপে ব্রাহ্মণ তাকে চিনতে পেরে তার কাছে গেলেন। শোভনও সেই ব্রাহ্মণকে দেখে আসন থেকে উঠে এসে তাঁর চরণ বন্দনা করলেন। শ্বশুর মুচুকুন্দ ও স্ত্রী চন্দ্রভাগা সহ নগরবাসী সকলের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ সকলের কুশল সংবাদ জানালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—এমন বিচিত্র মনোরম স্থান কেউ কখনও দেখেনি। আপনি কিভাবে এই স্থান প্রাপ্ত হলেন, তা সবিস্তারে আমার কাছে বর্ণনা করুন। শোভন বললেন যে, কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া রমা একাদশী সর্বব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি তা শ্রদ্ধারহিতভাবে পালন করলেও তার আশ্চর্যজনক এই ফল লাভ করেছি। আপনি কৃপা করে চন্দ্রভাগাকে সমস্ত ঘটনা জানাবেন।

সোমশর্ম্মা মুচুকুন্দপুরে ফিরে এসে চন্দ্রভাগার কাছে সমস্ত ঘটনার কথা জানালেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত চন্দ্রভাগা বললেন—হে ব্রাহ্মণ! আপনার কথা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। তখন সোমশর্ম্মা বললেন—হে পুত্রী, সেখানে তোমার স্বামীকে আমি স্বয়ং সচক্ষে দেখেছি। অগ্নিদেবের মতো দীপ্তিমান তার নগরও দর্শন করেছি। কিন্তু তার নগর স্থির নয়, তা যাতে স্থির হয় সেই মতো কোন উপায় কর। এসব কথা শুনে চন্দ্রভাগা বললেন, তাকে দেখতে আমার একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে। আমাকে এখনই তার কাছে নিয়ে চলুন। আমি ব্রত পালনের পুণ্যপ্রভাবে এই নগরকে স্থির করে দেব।

তখন সোমশর্ম্মা চন্দ্রভাগাকে নিয়ে মন্দার পর্বতে বামদেবের আশ্রমে উপনীত হলেন। সেখানে ঋষির কৃপায় ও হরিবাসর ব্রত পালনের ফলে চন্দ্রভাগা দিব্য শরীর ধারণ করল। দিব্য গতি লাভ করে নিজ স্বামীর নিকট উপস্থিত হলেন। প্রিয় পত্নীকে দেখে শোভন অতীব আনন্দিত হলেন।

বহুদিন পর স্বামীর সঙ্গ লাভ করে চন্দ্রভাগা অকপটে নিজের পুণ্যকথা জানালেন। হে প্রিয়, আজ থেকে আট বছর আগে আমি যখন পিতৃগৃহে ছিলাম তখন থেকেই এই রমা একাদশীর ব্রত নিষ্ঠাসহকারে পালন করতাম। ঐ পুণ্য প্রভাবে এই নগর স্থির হবে এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত থাকবে।

হে মহারাজ! মন্দারাচল পর্বতের শিখরে শোভন স্ত্রী চন্দ্রভাগা সহ দিব্যসুখ ভোগ করতে লাগলেন। পাপনাশিনী ও ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িনী রমা একাদশীর মাহাত্ম্য আপনার কাছে বর্ণনা করলাম। যিনি এই একাদশী ব্রত শ্রবণ করবেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে পূজিত হবেন।

উত্থান (প্রবোধিনী) একাদশী

কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা-নারদ সংবাদে বর্ণিত আছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে পুরুষোত্তম! কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম আমার কাছে কৃপা করে বর্ণনা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজন! কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী 'উত্থান' বা 'প্রবোধিনী' নামে খ্যাত। প্রজাপতি ব্রহ্মা পূর্বে নারদের কাছে এই একাদশীর মহিমা কীর্তন করেছিলেন। এখন তুমি আমার কাছে সেকথা শ্রবণ কর।

দেবর্ষি নারদ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বললেন—হে মহাত্মা! যে একাদশীতে ভগবান শ্রীগোবিন্দ শয়ন থেকে জেগে ওঠেন, সেই প্রবোধিনী বা উত্থান একাদশীর মহিমা আমার কাছে সবিস্তারে কীর্তন করুন।

ব্রহ্মা বললেন—হে নারদ! উত্থান একাদশী যথার্থই পাপনাশিনী, পুণ্যবর্ধিনী ও মুক্তিপ্রদায়ী। এই একাদশী ব্রত নিষ্ঠার সাথে পালন করলে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত রাজসূয় যজ্ঞের ফল অনায়াসে লাভ হয়। জগতের দুর্লভ বস্তুর প্রাপ্তির কথা আর কি বলব! এই একাদশী ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে ঐশ্বর্য্য, প্রজ্ঞা, রাজ্য ও সুখ প্রদান করে। এই ব্রতের প্রভাবে পর্বত প্রমাণ পাপরাশি বিনষ্ট হয়ে যায়। যারা একাদশীতে রাত্রি জাগরণ করেন, তাদের সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয়। শ্রেষ্ঠ মুনিগণ তপস্যার দ্বারা যে ফল করেন, এই ব্রতের উপবাসে তা পাওয়া যায়। যথাযথভাবে এই ব্রত পালন করলে আশাতীত ফল লাভ হয়। কিন্তু অবিধিতে উপবাস করলে স্বল্পমাত্র ফল প্রাপ্তি হয়। যারা এই একাদশীর ধ্যান করেন, তাদের পূর্বপুরুষেরা স্বর্গে আনন্দে বাস করেন। এই একাদশী উপবাস ফলে ব্রহ্মহত্যা জনিত ভয়ঙ্কর নরকযন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেয়ে বৈকুণ্ঠগতি লাভ হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ

দ্বারাও যা সহজে লাভ হয় না, তীর্থে স্বর্ণ প্রভৃতি দান করলে যে পুণ্য অর্জিত হয়, এই উপবাসের রাত্রি জাগরণে সেই সকল অনায়াসে লাভ হয়ে যায়।

যিনি সঠিকভাবে উত্থান একাদশীর ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তার গৃহে ত্রিভুবনের সমস্ত তীর্থ এসে উপস্থিত হয়। হে নারদ! বিষ্ণুর প্রিয়তমা এই প্রবোধিনী একাদশীর উপবাস করলে সর্বশাস্ত্রে জ্ঞান ও তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে চরমে মুক্তি লাভ হয়। যিনি সমস্ত লৌকিক ধর্ম পরিত্যাগ করে ভক্তিভরে এই ব্রত উপবাস করেন, তাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। এমনকি মন ও বাক্য দ্বারা অর্জিত পাপরাশিও শ্রীগোবিন্দের অর্চনে বিনষ্ট হয়ে যায়।

হে বৎস! এই ব্রতে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীজনার্দনের উদ্দেশ্যে স্নান, দান, জপ, কীর্তন ও হোমাদি করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। যারা উপবাস দিনে শ্রীহরির প্রতি ভক্তিভাবে দিনযাপন করেন, তাদের পক্ষে জগতে দুর্লভ বলে আর কিছু নেই। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণে স্নান করলে যে পুণ্য হয় এই উপবাসে রাত্রি জাগরণে তার সহস্রগুণ সুকৃতি লাভ হয়। তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম ধ্যান আদির ফলে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, উত্থান একাদশী না করলে সে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যায়। হে নারদ! শ্রীহরিবাসরে শ্রীজনার্দনের পূজা বিশেষ ভক্তিসহকারে করবে। তা না হলে শতজন্মার্জিত পুণ্যও বিফল হয়।

হে বৎস! যিনি কার্তিক মাসে সর্বদা ভাগবত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করেন। ভগবান হরিভক্তিমূলক শাস্ত্রপাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। কিন্তু দান, জপ, যজ্ঞাদি দ্বারা তেমন প্রীত হন না। এই মাসে শ্রীবিষ্ণুর নাম, গুণ, রূপ, লীলাদি শ্রবণ-কীর্তন অথবা শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের ফলে শত শত গোদানের ফল অচিরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতএব হে মুনিবর! কার্তিক মাসে সমস্ত গৌণধর্ম বর্জন করে শ্রীকেশবের সামনে হরিকথা শ্রবণ কীর্তন করা কর্তব্য। কোন ব্যক্তি যদি ভক্তিসহকারে এই মাসে ভক্তসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তবে তাঁর শতকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হন এবং হাজার হাজার দুগ্ধবতী গাভী দানের ফল অনায়াসে লাভ করেন। এই মাসে পবিত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণাদির শ্রবণ-কীর্তনে দিনযাপন করলে তার আর পুণর্জন্ম হবে না। এই মাসে বহু ফলমূল, ফুল, অগুরু, কর্পূর, ও চন্দন দিয়ে শ্রীহরির পূজা করা কর্তব্য।

সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয়, উত্থান একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদানে তার কোটিগুণ সুকৃতি অর্জিত হয়। শ্রবণ-কীর্তন, স্মরণ, বন্দনাদি নববিধা ভক্তির সাথে তুলসীর সেবার জন্য যারা বীজ রোপন, জলসেচন ইত্যাদি করেন, তারা মুক্তিলাভ করে বৈকুণ্ঠবাসী হন।

হে নারদ! সহস্র সুগন্ধী পুষ্পে দেবতার অর্চনে বা সহস্র সহস্র যজ্ঞ ও দানে যে ফল লাভ হয়, এই মাসের শ্রীহরিবাসরে একটি মাত্র তুলসী পাতা শ্রীভগবানের চরণকমলে অর্পণ করলে তার অনন্তকোটিগুণ ফল লাভ হয়।

উৎপন্না একাদশী

অর্জুন বললেন—হে দেব! অগ্রহায়ণের পুণ্যপ্রদায়ী কৃষ্ণপক্ষের একাদশীকে কেন 'উৎপন্না' বলা হয় এবং কি জন্যই বা এই একাদশী পরম পবিত্র ও দেবতাদেরও প্রিয়, তা জানতে ইচ্ছা করি। আপনি কৃপা করে আমাকে তা বলুন।

শ্রীভগবান বললেন—হে পৃথাপুত্র! পূর্বে সত্যযুগে 'মুর' নামে এক দানব ছিল। অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট সেই দানবের স্বভাব ছিল অত্যন্ত কোপন। সে দেবতাদেরও ভীতিপ্রদ ছিল। যুদ্ধে দেবতাদের এমনকি স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে পর্যন্ত পরাজিত করে স্বর্গ থেকে বিতারিত করেছিল। এইভাবে দেবতারা পৃথিবীতে বিচরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

তখন দেবতারা মহাদেবের কাছে গিয়ে নিজেদের সমস্ত দুঃখ সবিস্তারে জানালেন। শুনে মহাদেব বললেন—হে দেবরাজ! যেখানে শরণাগতবৎসল জগন্নাথ, গরুড়ধ্বজ বিরাজ করছেন, তোমরা সেখানে যাও। তিনি আশ্রিতদের পরিত্রাণকারী। তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের মঙ্গল বিধান করবেন।

দেবাদিদেবের কথমতো দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করলেন। জলে শায়িত শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করে দেবতারা হাতজোড় করে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। স্তুতির মাধ্যমে নিজ নিজ দৈন্য ও দুঃখের কথা তাঁরা ভগবানকে জানালেন।

ইন্দ্রের কথা শুনে ভগবান নারায়ণ বললেন—হে ইন্দ্র! সেই মুর দানব কি রকম, সে কেমন শক্তিশালী, তা আমায় বল।

ইন্দ্র বললেন—হে ভগবান! প্রাচীনকালে ব্রহ্ম বংশে তালজঙ্ঘা নামে এক অতি পরাক্রমী অসুর ছিল। তারই পুত্র সেই 'মুর' অত্যন্ত বলশালী, ভীষণ উৎকট ও দেবতাদেরও ভয় উৎপাদনকারী। সে চন্দ্রাবতী নামে এক পুরীতে বাস করে। স্বর্গ থেকে আমাদের বিতাড়িত করে তার স্বজাতি কাউকে রাজা, কাউকে অন্যান্য দিকপালরূপে

প্রতিষ্ঠিত করে এখন সে দেবলোক সম্পূর্ণ অধিকার করেছে। তার প্রবল প্রতাপে আজ আমরা পৃথিবীতে বিচরণ করছি।

ইন্দ্রের কথা শুনে ভগবান দেবদ্রোহীদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি দেবতাদের সঙ্গে চন্দ্রাবতী পুরীতে গেলেন। সেই দৈত্যরাজ শ্রীনারায়ণকে দর্শন করে পুনঃ পুনঃ গর্জন করতে লাগল। দেবতা ও অসুরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীনারায়ণকে একা দেখে সেই দানব তাঁকে 'দাঁড়াও দাঁড়াও' বলতে লাগল। শ্রীভগবানও ক্রোধে গর্জন করে বললেন—রে দুরাচার দানব আমার বাহুবল দেখ। এই বলে অসুরপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধাদের দিব্য বাণের আঘাতে নিহত করতে লাগলেন। তখন তারা প্রাণভয়ে নানা দিকে পালাতে লাগল। সেই সময় নারায়ণ দৈত্য সৈন্যদের মধ্যে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করলেন। ফলে সমস্ত সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। একমাত্র মুর অসুরই জীবিত ছিল। সে অস্ত্রযুদ্ধে নারায়ণকেও পরাজিত করল। তখন নারায়ণ দৈত্যের সাথে বাহুযুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

এইভাবে দেবতাদের হিসাবে এক হাজার বছর যুদ্ধ করেও ভগবান তাকে পরাজিত করতে পারলেন না। তখন শ্রীহরি বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে বদরিকা আশ্রমে গমন করলেন। সেখানে সিংহাবতী নামে একটি গুহা আছে। এই গুহাটি এক-দ্বার বিশিষ্ট এবং বারোযোজন অর্থাৎ ৮৬ মাইল বিস্তৃত। ভগবান বিষ্ণু সেই গুহার মধ্যে শয়ন করলেন। সেই দৈত্যও তার পিছন পিছন ধাবিত হয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করল। সে বিষ্ণুকে নিদ্রিত বুঝতে পারল। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ভাবতে লাগল—আমার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিষ্ণু এখানে গোপনে শুয়ে আছে। এখন আমি তাকে অবশ্যই বধ করব। দানবের এইরকম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুর শরীর থেকে একটি কন্যা উৎপন্ন হল।

এই কন্যাই 'উৎপন্না' একাদশী। তিনি রূপবতী, সৌভাগ্যশালিনী, দিব্য অস্ত্র-শস্ত্রধারিনী ও বিষ্ণু তেজসম্ভূতা বলে মহাপরাক্রমশালী ছিলেন। দৈত্যরাজ সেই স্ত্রীরূপিনী দেবীর সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু করল। কিছুকাল যুদ্ধের পর দেবীর দিব্য তেজে অসুর ভস্মীভূত হয়ে গেল। তারপর বিষ্ণু জেগে উঠে সেই ভস্মীভূত দানবকে দেখে বিস্মিত হলেন। এক দিব্যকন্যাকে তাঁর পাশে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন।

বিষ্ণু বললেন—হে মহাপরাক্রান্ত উগ্রমূর্তি! এই মুর দানবকে কে বধ করল? যিনি একে হত্যা করেছে তিনি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় কর্ম করেছে।

সেই কন্যা বললেন—হে প্রভু! আমি আপনার শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন এই দানব আপনাকে বধ করতে চেয়েছিল। তা দেখে আমি তাকে বধ করেছি। আপনাদের কৃপাতেই আমি তাকে বধ করতে পেরেছি।

একথা শুনে ভগবান বললেন—আমার পরাশক্তি তুমি একাদশীতে উৎপন্ন হয়েছ। তাই তোমার নাম হবে একাদশী। আমি এই ত্রিলোকে দেবতা ও ঋষিদের অনেক বর প্রদান করেছি। হে ভদ্রে! তুমিও তোমার মনমতো বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তা প্রদান করব।

একাদশী বললেন—হে দেবেশ! ত্রিভুবনের সর্বত্র আপনার কৃপায় সর্ববিঘ্ননাশিনী ও সর্বদায়িনী রূপে যেন পরম পূজ্য হতে পারি, এ বিধান করুন। আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ যারা শ্রদ্ধাসহকারে আমার ব্রত-উপবাস করবে, তাদের সর্বসিদ্ধি লাভ হবে—এই বর প্রদান করুন।

বিষ্ণু বললেন—হে কল্যাণী! তাই হোক। 'উৎপন্না' নামে প্রসিদ্ধ তোমার ব্রত পালনকারীর সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি তাদের সকল মনোবাসনা পূর্ণ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তোমাকে আমার শক্তি বলে মনে করি। তাই তোমার ব্রত পালনকারী সকলে আমারই

পূজা করবে। এর ফলে তারা মুক্তি লাভ করবে। তুমি হরিপ্রিয়া নামে জগতে বিখ্যাত হবে। তুমি ব্রতপালনকারীর শত্রুবিনাশ, পরমগতি দান এবং সর্বসিদ্ধি প্রদান করতে সমর্থ হবে। ভগবান বিষ্ণু এইভাবে 'উৎপন্না' একাদশীকে বরদান করে অন্তর্হিত হলেন।

সমস্ত ব্রতকারী দিবারাত্রি ভক্তিপরায়ণ হয়ে এই উৎপন্না একাদশীর উৎপত্তির কথা শ্রবণ-কীর্তন করলে শ্রীহরির আশীর্বাদ লাভে ধন্য হবেন।

মোক্ষদা একাদশী

যুধিষ্ঠির বললেন—হে বিষ্ণো! আপনাকে আমি বন্দনা করি। আপনি ত্রিলোকের সুখদায়ক, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বপালক ও পুরুষোত্তম। আমার একটি সংশয় আছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের যে একাদশী তার নাম কি, বিধিই বা কি ও কোন দেবতা এই একাদশীতে পূজিত হন, তা আমায় বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহারাজ! আপনি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, যার মাধ্যমে আপনার যশ চতুর্দিকে বিস্তৃত হবে। এখন এই একাদশীর কথা আমি বর্ণনা করছি যা শোনা মাত্রই বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের এই একাদশী 'মোক্ষদা' নামে পরিচিত। সর্বপাপনাশিনী ও ব্রত মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা এই একাদশীর দেবতা শ্রীদামোদর। তুলসী, তুলসী মঞ্জরী, ধূপ, দীপ, ইত্যাদি উপচারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীদামোদরের পূজা করতে হবে। পূর্ববর্ণিত বিধি অনুসারে দশমী ও একাদশী পালন করতে হবে। এই উপবাস দিনে স্তবস্তুতি, নৃত্য-গীত আদি সহ রাত্রিজাগরণ করা কর্তব্য।

হে মহারাজ! প্রসঙ্গক্রমে একটি অলৌকিক কাহিনী আমি বলছি। মনোযোগ দিয়ে এই ইতিহাস শ্রবণ মাত্রই সর্বপাপ ক্ষয় হয়। যে পিতৃপুরুষেরা নিজ নিজ পাপে অধঃযোনি প্রাপ্ত হয়েছে, এই ব্রত পালনের পুণ্যফল বিন্দু মাত্র তাদেরকে দান করলে তারাও মুক্তিলাভের যোগ্য হন।

কোন এক সময় মনোরম চম্পক নগরে বৈখানস নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সমস্ত বৈষ্ণব সদ্‌গুণে বিভূষিত। প্রজাদের তিনি পুত্রের মতো পালন করতেন। তাঁর রাজ্যে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। রাজ্যের সকলেই ছিল বেশ সমৃদ্ধশালী। একবার রাজা স্বপ্নে দেখলেন যে তার পিতা নরকে পতিত হয়েছেন। তা দেখে

তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। পরদিন ব্রাহ্মণদের ডেকে বলতে লাগলেন—হে ব্রাহ্মণগণ! গতরাত্রিতে স্বপ্নে নরকযাতনায় পিতাকে কষ্ট পেতে দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন—'হে পুত্র, তুমি আমাকে নরকসমুদ্র থেকে উদ্ধার কর।' তাঁর সেই অবস্থা দেখে আমার অন্তরে সুখ নেই। আমার এই বিশাল রাজ্য, স্ত্রী-পুত্র, কিছুতেই আমি শান্তি পাচ্ছি না। কি করি, কোথায় যাই কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার পূর্বপুরুষেরা মুক্তিলাভ করতে পারেন এমন কোন পুণ্যব্রত, তপস্যা ও যোগের কথা আমাকে উপদেশ করুন। আমি তা অনুষ্ঠান করব। আমার মতো পুত্র বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি পিতামাতা পূর্বপুরুষেরা যদি নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকেন, তবে সে পুত্রের কি প্রয়োজন?

ব্রাহ্মণগণ বললেন—হে মহারাজ! আপনার রাজ্যের কাছেই মহর্ষি পর্বত মুনির আশ্রম রয়েছে। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। তাঁর কাছে আপনার মুক্তির উপায় জানতে পারবেন।

ব্রাহ্মণদের উপদেশ শ্রবণ করে মহাত্মা বৈখানস তাঁদের সঙ্গে নিয়ে সেই পর্বত মুনির আশ্রমে গমন করলেন। তাঁরা দূর থেকে ঋষিবরকে সষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তার কাছে গেলেন। মুনিবর রাজার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

রাজা বললেন—হে প্রভু! আপনার কৃপায় আমার সবই কুশল। তবে আমি একদিন স্বপ্নযোগে পিতার নরকযন্ত্রণা ও কাতর আর্তনাদ্ শুনে অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তাগ্রস্ত হয়েছি। হে ঋষিবর! কোন পুণ্যের ফলে তিনি সেই দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবেন, তার উপায় জানতেই আপনার শরণাগত হয়েছি।

রাজার কথা শুনে পর্বত মুনি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে বললেন—হে মহারাজ! পূর্বজন্মে তোমার পিতা অত্যন্ত কামাচারী হওয়ায় তার এরকম অধোগতি লাভ হয়েছে। এখন এই পাপ থেকে মুক্তির উপায় বর্ণনা

করছি। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের মোক্ষদা একাদশী পালন করে সেই পুণ্যফল পিতাকে প্রদান কর। সেই পুণ্য প্রভাবে তোমার পিতার মুক্তি লাভ হবে।

মুনির কথা শোনার পর রাজা নিজগৃহে ফিরে এলেন। সেই পবিত্র তিথির আবির্ভাবে তিনি স্ত্রী-পুত্রাদিসহ যথাবিধি মোক্ষদা একাদশী ব্রত পালন করলেন। ব্রতের পুণ্যফল পিতার উদ্দেশ্যে প্রদান করলেন। ঐ পুণ্যফল দানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। 'হে পুত্র তোমার মঙ্গল হোক।' এই বলতে বলতে বৈখানস রাজার পিতা নরক থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গে গমন করলেন।

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি এই মঙ্গলদায়িনী মোক্ষদা একাদশী ব্রত পালন করে, তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করে। এই ব্রতের পুণ্যসংখ্যা আমিও জানি না। চিন্তামণির মতো এই ব্রতটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই ব্রত কথা যিনি পাঠ করেন এবং যিনি শ্রবণ করেন, উভয়েই বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন।

সফলা একাদশী

• পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম 'সফলা'। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে এই তিথির মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে প্রভু! পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম, বিধি এবং পূজ্যদেবতা বিষয়ে আমার কৌতুহল নিবারণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহারাজ! আপনার প্রতি স্নেহবশত সেই ব্রত কথা বিষয়ে বলছি। এই ব্রত আমাকে যেরকম সন্তুষ্ট করে, বহু দানদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞাদি দ্বারা আমি সেরকম সন্তুষ্ট হই না। তাই যত্নসহকারে এই ব্রত পালন করা কর্তব্য।

পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর নাম 'সফলা'। নাগদের মধ্যে যেমন শেষনাগ, পক্ষীদের মধ্যে গরুড়, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, দেবতাদের মধ্যে নারায়ণ সর্বশ্রেষ্ঠ; তেমনই সকল ব্রতের মধ্যে একাদশী ব্রতই সর্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! যারা এই ব্রত পালন করেন, তারা আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাদের এজগতে ধনলাভ ও পরজগতে মুক্তি লাভ হয়। হাজার হাজার বছর তপস্যায় যে ফল লাভ হয় না, একমাত্র সফলা একাদশীতে রাত্রি জাগরণের ফলে তা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহিস্মত নামে এক রাজা প্রসিদ্ধ চম্পাবতী নগরে বাস করতেন। রাজার চারজন পুত্র ছিল। কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র লুম্ভক সর্বদা পরস্ত্রীগমন, মদ্যপান প্রভৃতি অসৎ কার্যে রত ছিল। সে সর্বক্ষণ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দেবতাদের নিন্দা করত। পুত্রের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজা তাকে রাজ্য থেকে বার করে দিলেন। স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যক্ত হয়ে সে এক গভীর বনে প্রবেশ করল। সেখানে কখনও জীবহত্যা আবার কখনও চুরি করে জীবন ধারণ করতে লাগল। কিছুদিন পরে একদিন সে নগরে প্রহরীদের কাছে ধরা পড়ল। কিন্তু রাজপুত্র বলে সেই অপরাধ থেকে সে মুক্তি পেল। পুনরায় সে বনে ফিরে গিয়ে জীবহত্যা ও ফলমূল আহার করে দিন যাপন করতে লাগল।

ঐ বনে বহু বছরের পুরানো একটি বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। সেখানে ভগবান শ্রীবাসুদেব বিরাজমান বলে বৃক্ষটি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সেই বৃক্ষতলে পাপবুদ্ধি লুম্ভক বাস করত। বহুদিন পর তার পূর্বজন্মের কোন পুণ্য ফলে সে পৌষ মাসের দশমী দিনে কেবল ফল আহারে দিন অতিবাহিত করল। কিন্তু রাত্রিতে অসহ্য শীতের প্রকোপে সে মৃতপ্রায় হয়ে রাত্রিযাপন করল। পরদিন সূর্যোদয় হলেও সে অচেতন হয়েই পড়ে রইল। দুপুরের দিকে তার চেতনা ফিরল। ক্ষুধা নিবারণের জন্য সে অতিকষ্টে কিছু ফল সংগ্রহ করল। এরপর সেই বৃক্ষতলে এসে পুনরায় বিশ্রাম করতে থাকল। রাত্রিতে খাদ্যাভাবে সে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল। সে প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফলগুলি নিয়ে—'হে ভগবান! আমার কি গতি হবে' বলে অশ্রুপাত করতে করতে সেই বৃক্ষমূলে, 'হে লক্ষ্মীপতি নারায়ণ! আপনি প্রসন্ন হোন' বলে নিবেদন করল। এইভাবে সে অনাহারে ও অনিদ্রায় সেই রাত্রি যাপন করল।

ভগবান নারায়ণ সেই পাপী লুম্ভকের রাত্রি জাগরণকে একাদশীর জাগরণ এবং ফল অর্পণকে পূজা বলে গ্রহণ করলেন। এইভাবে অজ্ঞাতসারে লুম্ভকের সফলা একাদশী ব্রত পালন হয়ে গেল। প্রাতঃকালে আকাশে দৈববাণী হল—হে পুত্র, তুমি সফলা ব্রতের পুণ্য প্রভাবে রাজ্য প্রাপ্ত হবে। সেই দৈববাণী শোনামাত্র লুম্ভক দিব্যরূপ লাভ করল। তার পাপবুদ্ধি দূর হল। সে পুনরায় নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করল। স্ত্রীপুত্রসহ কিছুকাল রাজসুখ ভোগের পর পুত্রের ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করল। অবশেষে মৃত্যুকালে সে অশোক অভয় ভগবানের কাছে ফিরে গেল।

হে মহারাজ! এভাবে সফলা একাদশী যিনি পালন করেন, তিনি জাগতিক সুখ ও পরে মুক্তি লাভ করেন। এই ব্রতে যারা শ্রদ্ধাশীল তাঁরাই ধন্য। তাঁদের জন্ম সার্থক, এতে কোন সন্দেহ নেই। এই ব্রত পাঠ ও শ্রবণে মানুষের রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

পুত্রদা একাদশী

যুধিষ্ঠির বললেন—হে কৃষ্ণ! পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কি, বিধিই বা কি, কোন দেবতা ঐ দিনে পূজিত হন এবং আপনি কার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সেই ব্রতফল প্রদান করেছিলেন কৃপা করে আমাকে সবিস্তারে তা বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহারাজ! এই একাদশী 'পুত্রদা' নামে প্রসিদ্ধ। সর্বপাপবিনাশিনী ও কামদা এই একাদশীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হলেন সিদ্ধিদাতা নারায়ণ। ত্রিলোকে এর মতো শ্রেষ্ঠ ব্রত নেই। এই ব্রতকারীকে নারায়ণ বিদ্বান ও যশস্বী করে তোলেন। এখন আমার কাছে ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণ ক ন।

ভদ্রাবতী পুরীতে সুকেতুমান নামে এক রাজা ছিলেন। তার রানীর নাম ছিল শৈব্যা। রাজদম্পতি বেশ সুখেই দিনযাপন করছিলেন। বং শরক্ষার জন্য বহুদিন ধরে ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠান করেও যখন পুত্রলাভ হল না, তখন রাজা দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন। তাই সকল ঐশ্বর্যবান হয়েও পুত্রহীন রাজার মনে কোন সুখ ছিল না। তিনি ভাবতেন—পুত্রহীনের জন্ম বৃথা ও গৃহশূন্য। পিতৃ-দেব-মনুষ্যলোকের কাছে যে ঋণ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, তা পুত্র বিনা পরিশোধ হয় না। পুত্রবানজনের এ জগতে যশলাভ ও উত্তম গতি লাভ হয় এবং তাদের আয়ু, আরোগ্য, সম্পত্তি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। নানা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাজা আত্মহত্যা করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু পরে বিচার করে দেখলেন—'আত্মহত্যা মহাপাপ, এরফলে কেবল দেহের বিনাশমাত্র হবে, কিন্তু আমার পুত্রহীনতা তো দূর হবে না।

তারপর একদিন রাজা নিবিড় বনে গমন করলেন। বন ভ্রমণ করতে করতে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলে রাজা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হলেন। এদিক ওদিক জলাদির অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তিনি চক্রবাক, রাজহংস এবং নানারকম মাছে পরিপূর্ণ একটি মনোরম সরোবর দেখতে পেলেন। সরোবরের কাছে মুনিদের একটি আশ্রম ছিল। তিনি

সেখানে উপস্থিত হলেন। সরোবর তীরে মুনিগণ বেদপাঠ করছিলেন। মুনিবৃন্দের শ্রীচরণে তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন।

মুনিগণ রাজাকে বললেন—হে মহারাজ! আমরা আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। আপনার কি প্রার্থনা বলুন।

রাজা বললেন—আপনারা কে এবং কিজন্যই বা এখানে সমবেত হয়েছেন?

মুনিগণ বললেন—হে মহারাজ! আমরা 'বিশ্বদেব' নামে প্রসিদ্ধ। এই সরোবরে স্নান করতে এসেছি। আজ থেকে পাঁচদিন পরেই মাঘ মাস আরম্ভ হবে। আজ পুত্রদা একাদশী তিথি। পুত্র দান করে বলেই এই একাদশীর নাম 'পুত্রদা'।

তাঁদের কথা শুনে রাজা বললেন—হে মুনিবৃন্দ! আমি অপুত্রক। তাই পুত্র কামনায় অধীর হয়ে পড়েছি। এখন আপনাদের দেখে আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে। এ দুর্ভাগা পুত্রহীনের প্রতি অনুগ্রহ করে একটি পুত্র প্রদান করুন।

মুনিগণ বললেন—হে মহারাজ! আজ সেই পুত্রদা একাদশী তিথি। তাই এখনই আপনি এই ব্রত পালন করুন। ভগবান শ্রীকেশবের অনুগ্রহে অবশ্যই আপনার পুত্র লাভ হবে। মুনিদের কথা শোনার পর যথাবিধানে রাজা কেবল ফলমূলাদি আহার করে সেই ব্রত অনুষ্ঠান করলেন। দ্বাদশী দিনে উপযুক্ত সময়ে শস্যাদি সহযোগে পারণ করলেন। মুনিদের প্রণাম নিবেদন করে নিজগৃহে ফিরে এলেন। ব্রতপ্রভাবে রাজার যথাসময়ে একটি তেজস্বী পুত্র লাভ হল।

হে মহারাজ! এ ব্রত সকলেরই পালন করা কর্তব্য। মানব কল্যাণ কামনায় আপনার কাছে আমি এই ব্রত কথা বর্ণনা করলাম। নিষ্ঠাসহকারে যারা এই পুত্রদা একাদশী ব্রত পালন করবে, তারা 'পুত' নামক নরক থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। আর এই ব্রত কথা শ্রবণ-কীর্তনে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে।

ষট্‌তিলা একাদশী

মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের 'ষট্‌তিলা' একাদশীর মাহাত্ম্য ভবিষ্যোত্তরপুরাণে বর্ণিত আছে।

যুধিষ্ঠির মহারাজ বললেন—হে জগন্নাথ! মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথির নাম কি, বিধিই বা কি এবং তার কি ফল, সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

তদুত্তরে ভগবান বললেন—হে রাজন! এই একাদশী 'ষট্‌তিলা' নামে জগতে বিদিত।

একসময় দাল্‌ভ্য ঋষি মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্তকে জিজ্ঞাসা করেন—মর্ত্যলোকে মানুষেরা ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, অন্যের সম্পদ হরণ আদি পাপকর্ম দ্বারা নরকে গমন করে। যাতে তারা নরক গতি থেকে রক্ষা পায়, তা যথাযথভাবে আমাকে উপদেশ করুন। অনায়াসে সাধন করা যায় এমন কোন কাজের মাধ্যমে যদি তাদের এই পাপ থেকে উদ্ধারের কোন উপায় থাকে, তবে তা বলুন।

ঋষি পুলস্ত্য বললেন, হে মহাভাগ! তুমি একটি গোপনীয় উত্তম বিষয়ের প্রশ্ন করেছ। মাঘ মাসে শুচি, জিতেন্দ্রিয়, কাম, ক্রোধ আদি শূন্য হয়ে স্নানের পর সর্বদেবেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করবে। পূজাতে কোন বিঘ্ন ঘটলে কৃষ্ণনাম স্মরণ করবে। রাত্রিতে অর্চনান্তে হোম করবে। তারপর চন্দন, অগুরু, কর্পূর ও শর্করা প্রভৃতি দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুত করে ভগবানকে নিবেদন করবে। কুষ্মাণ্ড, নারকেল অথবা একশত গুবাক দিয়ে অর্ঘ্য প্রদান করবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্ত্বমগতীনাং গতির্ভব' ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে হয়। 'কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রীত হোন' বলে যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে জলপূর্ণ কলস, ছত্র, বস্ত্র, পাদুকা, গাভী ও তিলপাত্র দান করবে। স্নান, দানাদি কার্যে কালো তিল অত্যন্ত শুভ।

হে দ্বিজত্তম! ঐ প্রদত্ত তিল থেকে পুনরায় যে তিল উৎপন্ন হয়, ততো বছর ধরে দানকারী স্বর্গলোকে বাস করে। তিলদ্বারা স্নান, তিল

শরীরে ধারণ, তিল জলে মিশিয়ে তা দিয়ে তর্পণ, তিল ভোজন এবং তিল দান—এই ছয় প্রকার বিধানে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়ে থাকে। এই জন্য এই একাদশীর নাম ষট্‌তিলা।

হে যুধিষ্ঠির! একসময় নারদও এই ষট্‌তিলা একাদশীর ফল ও ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাইলে যে কাহিনী আমি বলেছিলাম তা এখন তোমার কাছে বর্ণনা করছি।

পুরাকালে মর্ত্যলোকে এক ব্রাহ্মণী বাস করত। সে প্রত্যহ ব্রত আচরণ ও দেবপূজাপরায়ণা ছিল। উপবাস ক্রমে তার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। সেই মহাসতী ব্রাহ্মণী অন্যের কাছ থেকে দ্রব্যাদি গ্রহণ করে দেবতা, ব্রাহ্মণ, কুমারীদের ভক্তিভরে দান করত। কিন্তু কখনও ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান ও ব্রাহ্মণকে অন্নদান করেনি। এইভাবে বহু বছর অতিক্রান্ত হল। আমি চিন্তা করলাম, কষ্টসাধ্য বিভিন্ন ব্রত করার ফলে এই ব্রাহ্মণীর শরীরটি শুকিয়ে যাচ্ছে। সে যথাযথভাবে বৈষ্ণবদের অর্চনও করেছে, কিন্তু তাদের পরিতৃপ্তির জন্য কখনও অন্ন দান করেনি। তাই আমি একদিন কাপালিক রূপ ধারণ করে তামার পাত্র হাতে নিয়ে তার কাছে গিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করলাম।

ব্রাহ্মণী বলল—হে ব্রাহ্মণ! তুমি কোথা থেকে এসেছ, কোথায় যাবে, তা আমাকে বলো।

আমি বললাম—হে সুন্দরী! আমাকে ভিক্ষা দাও। তখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার পাত্রে একটি মাটির ঢেলা নিক্ষেপ করল। তারপর আমি সেখান থেকে চলে গেলাম।

বহুকাল পরে সেই ব্রাহ্মণী ব্রতপ্রভাবে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করল। মাটির ঢেলা দানের ফলে একটি মনোরম গৃহ সে প্রাপ্ত হল। কিন্তু হে নারদ! সেখানে কোন ধান ও চাল কিছুই ছিল না। গৃহশূন্য দেখে মহাক্রোধে সে আমার কাছে এসে বলল—আমি ব্রত, কৃচ্ছ্রসাধন ও উপবাসের মাধ্যমে নারায়ণের আরাধনা করেছি। এখন হে জনার্দন! আমার গৃহে কিছুই দেখছি না কেন?

হে নারদ! তখন আমি তাকে বললাম—তুমি নিজ গৃহে দরজা বন্ধ করে বসে থাকো। মর্ত্যলোকের মানবী স্বশরীরে স্বর্গে এসেছে শুনে দেবতাদের পত্নীরা তোমাকে দেখতে আসবে। কিন্তু তুমি দরজা খুলবে না। তুমি তাদের কাছে ষট্‌তিলা ব্রতের পুণ্যফল প্রার্থনা করবে। যদি তারা সেই ফল প্রদানে রাজি হয়, তবেই দরজা খুলবে।

এরপর দেবপত্নীরা সেখানে এসে তার দর্শন প্রার্থনা করল। ষট্‌তিলা ব্রতের ফল পেলেই কেবল সেই মানবী দর্শন দেবেন জেনে তাদের মধ্যে এক দেবপত্নী তাঁর ষট্‌তিলা ব্রতজনিত পুণ্যফল তাকে প্রদান করল। তখন সেই ব্রাহ্মণী দিব্যকান্তি বিশিষ্টা হল এবং তার গৃহ ধনধান্যে ভরে গেল। দ্বার উদঘাটন করলে দেবপত্নীরা তাকে দর্শন করে বিস্মিত হলেন।

হে নারদ! অতিরিক্ত বিষয়বাসনা করা উচিত নয়। বিত্ত শাঠ্যও অকর্তব্য। নিজ সাধ্যমতো তিল, বস্ত্র ও অন্ন দান করবে। ষট্‌তিলা ব্রতের প্রভাবে দারিদ্রতা, শারীরিক কষ্ট, দুর্ভাগ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই বিধি অনুসারে তিলদান করলে মানুষ অনায়াসে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

জয়া একাদশী

মাঘী শুক্লপক্ষীয়া 'জয়া' একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য ভবিষ্যোত্তরপুরাণে যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদরূপে বর্ণিত আছে।

শ্রীগরুড়পুরাণে মাঘ মাসের শুক্লাপক্ষীয়া একাদশী তিথিকে 'ভৈমী' একাদশী নামে অভিহিত করা হয়েছে। কল্পান্তরে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন নাম দেখা যায়। পদ্মপুরাণ অনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর নামই 'পাণ্ডবা নির্জলা' বা 'ভীমসেনী' (ভৈমী) একাদশী।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে কৃষ্ণ! আপনি কৃপা করে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর সবিশেষ বর্ণনা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহারাজ! মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী 'জয়া' নামে প্রসিদ্ধ। এই তিথি সর্বপাপবিনাশিনী, সর্বশ্রেষ্ঠা, পবিত্রা, সর্বকাম ও মুক্তি প্রদায়িনী। এই ব্রতের ফলে মানুষ কখনও প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না। এই একাদশীর নিম্নরূপ উপাখ্যান শোনা যায়।

একসময় স্বর্গলোকে ইন্দ্র রাজত্ব করছিলেন। সেখানে অন্য দেবতারাও বেশ সুখেই ছিলেন। তারা পারিজাত পুষ্প শোভিত নন্দনকাননে অপ্সরাদের সাথে বিহার করতেন। একদিন পঞ্চাশ কোটি অপ্সরা-নায়ক দেবরাজ ইন্দ্র স্বেচ্ছায় আনন্দভরে তাদের নৃত্য করতে বললেন। নৃত্যের সাথে গন্ধর্বগণ গান করতে লাগলেন। পুষ্পদন্ত, চিত্রসেন প্রভৃতি প্রধান প্রধান গন্ধর্বেরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চিত্রসেনের পত্নীর নাম মালিনী। পুষ্পবন্তী নামে তাঁদের এক কন্যা ছিল। পুষ্পদন্তের পুত্রের নাম মাল্যবান। এই মাল্যবান পুষ্পবন্তীর রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। পুষ্পবন্তী পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ দ্বারা মাল্যবানকে বশীভূত করেছিল।

ইন্দ্রের প্রীতিবিধানের জন্য তারা দুজনেই নৃত্যগীতের সেই সভায় যোগদান করেছিল। কিন্তু একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট থাকায় উভয়েরই চিত্ত বিভ্রান্ত হচ্ছিল। সেখানে তারা পরস্পর কেবল দৃষ্টিবদ্ধ অবস্থায়

দাঁড়িয়ে থাকল। ফলে গানের ক্রম বিপর্যয় ঘটল। তাদের এইরকম তাল-মান ভঙ্গভাব দেখে তারা যে পরস্পর কামাসক্ত হয়েছে, দেবরাজ ইন্দ্র তা বুঝতে পারলেন। তখন ক্রোধবশে তিনি তাদের অভিশাপ দিলেন—রে মূঢ়! তোমরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছ। তোমাদের ধিক! এখনই তোমরা পিশাচযোনী লাভ করে মর্ত্যলোকে নিজ দুষ্কর্মের ফল ভোগ কর।

ইন্দ্রের অভিশাপে তারা দুজন দুঃখিত মনে হিমালয় পর্বতে বিচরণ করছিল। পিশাচত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তারা অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে লাগল। হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতে কাতর হয়ে নিজেদের পূর্বপরিচয় বিস্মৃত হল। এইভাবে অতিকষ্টে সেখানে দিনযাপন করতে লাগল।

একদিন পিশাচ নিজপত্নী পিশাচীকে বলল—সামান্য মাত্র পাপ করিনি। অথচ নরকযন্ত্রণার মতো পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। অতএব এখন থেকে আর কখনও কোন পাপকর্ম করব না। এইভাবে চিন্তা করে তারা সেই পর্বতে মৃতপ্রায় বাস করতে লাগল। মাল্যবান ও পুষ্পবন্তীর পূর্ব কোন পুণ্যবশত সেই সময় মাঘী শুক্লপক্ষীয়া 'জয়া' একাদশী তিথি উপস্থিত হল। তারা একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে নিরাহারে নির্জলা অবস্থায় দিবানিশি যাপন করল। শীতের প্রকোপে অনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত হল।

পরদিন সূর্যোদয়ে দ্বাদশী তিথি উপস্থিত হল। জয়া একাদশীর দিন অনাহার ও রাত্রি জাগরণে তাদের ভক্তির অনুষ্ঠান পালিত হল। এই ব্রত পালনের ফলে ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় তাদের পিশাচত্ব দূর হল। তারা দুজনেই তাদের পূর্বরূপ ফিরে পেল। তারপর তারা স্বর্গে ফিরে গেল। দেবরাজ তাদেরকে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কোন পুণ্য ফলে তোমাদের পিশাচত্ব দূর হল। আমার অভিশাপ থেকে কে তোমাদের মুক্ত করল?

মাল্যবান বললেন—হে প্রভু! ভগবান বাসুদেবের কৃপায় জয়া একাদশী ব্রতের পুণ্যপ্রভাবে আমাদের পিশাচত্ব দূর হয়েছে। তাদের কথা শুনে দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—হে মাল্যবান, তোমরা এখন থেকে আবার অমৃত পান কর। একাদশী ব্রতে যাঁরা আসক্ত এবং যাঁরা কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ তাঁরা আমাদেরও পূজ্য বলে জানবে। এই দেবোলোকে তুমি পুষ্পবন্তীর সাথে সুখে বাস কর।

হে মহারাজ! এই 'জয়া' ব্রত ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপকেও বিনাশ করে। এই ব্রত পালনে সমস্ত প্রকার দানের ফল লাভ হয়। সকল যজ্ঞ ও তীর্থের পুণ্যফল এই একাদশী প্রভাবে আপনা হতেই লাভ হয়। অবশেষে মহানন্দে অনন্তকাল বৈকুণ্ঠ বাস হয়। এই জয়া একাদশী ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

বিজয়া একাদশী

স্কন্দপুরাণে এই একাদশী মহাত্ম্য এইভাবে বর্ণিত রয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে বাসুদেব! ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর মাহাত্ম্য অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে যুধিষ্ঠির! এই একাদশী 'বিজয়া' নামে পরিচিত। এই একাদশী সম্পর্কে একসময় দেবর্ষি নারদ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, তা আমি এখন তোমকে বলছি। এই পবিত্র পাপবিনাশকারী ব্রত মানুষকে জয় দান করে বলে 'বিজয়া' নামে প্রসিদ্ধ।

পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে তিনি পঞ্চবটী বনে বাস করতেন। সেই সময় লঙ্কাপতি রাবণ দেবী সীতাকে হরণ করে। সীতার অনুসন্ধানে রামচন্দ্র চতুর্দিক ভ্রমণ করতে থাকেন। তখন মৃতপ্রায় জটায়ুর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। জটায়ু রাবণের সীতাহরণের সমস্ত বৃত্তান্ত রামচন্দ্রকে জানিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এরপর সীতা উদ্ধারের জন্য বানররাজ সুগ্রীবের সাথে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

ভগবান রামচন্দ্রের কৃপায় হনুমান লঙ্কায় গমন করেন। সেখানে অশোক বনে সীতাদেবীকে দর্শন করে শ্রীরাম প্রদত্ত অঙ্গুরীয় (আংটি) তাঁকে অর্পণ করেন। ফিরে এসে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে লঙ্কার সমস্ত ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন। হনুমানের কথা শুনে রামচন্দ্র সুগ্রীবের পরামর্শে সমুদ্রতীরে যান। সেই দুস্তর সমুদ্র দেখে তিনি লক্ষ্মণকে বললেন—'হে লক্ষ্মণ! কিভাবে এই অগাধ সমুদ্র পার হওয়া যায়। তার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।'

উত্তরে লক্ষ্মণ বললেন—'হে পুরুষোত্তম! সর্বজ্ঞাতা আদিদেব আপনি, আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব? তবে বক্‌দালভ্য নামে এক মুনি এই দ্বীপে বাস করেন। এখান থেকে চার মাইল দূরে তাঁর

আশ্রম। হে রাঘব, আপনি সেই প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠকে এর উপায় জিজ্ঞাসা করুন।' লক্ষ্মণের মনোরম কথা শুনে, তারা সেই মহামুনির আশ্রমে উপনীত হলেন। ভগবান রামচন্দ্র ভক্তরাজ সেই মুনিকে প্রণাম করলেন। মুনিবর রামচন্দ্রকে পুরাণপুরুষ বলে জানতে পারলেন। আনন্দভরে জিজ্ঞাসা করলেন—হে রামচন্দ্র! কি কারণে আপনি আমার কাছে এসেছেন, তা কৃপা করে বলুন।

শ্রীরামচন্দ্র বললেন—হে মুনিবর! আপনার কৃপায় সৈন্যসহ আমি এই সমুদ্র তীরে উপস্থিত হয়েছি। রাক্ষসরাজের লঙ্কা বিজয় করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। যাতে এই ভয়ঙ্কর সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে পারি তার উপায় জানবার জন্য আমরা আপনার কৃপা প্রার্থনা করি। মুনিবর প্রসন্নচিত্তে পদ্মলোচন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন—'হে রাম! আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে শ্রেষ্ঠ ব্রত করণীয় আমি তা বলছি। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের 'বিজয়া' নামক একাদশী ব্রতপালনে আপনি নিশ্চয়ই সৈন্যসহ সমুদ্র পার হতে পারবেন। এই ব্রতের বিধি শ্রবণ করুন। বিজয় লাভের জন্য দশমীর দিন সোনা, রূপা, তামা অথবা মাটির কলস সংগ্রহ করে তাতে জল ও আমপাতা দিয়ে সুগন্ধি চন্দনে সাজিয়ে তার উপর সোনার নারায়ণমূর্তি স্থাপন করবেন। একাদশীর দিন যথাবিধি প্রাতঃস্নান করে কলসের গলায় মালা চন্দন পড়িয়ে উপযুক্ত স্থানে নারকেল ও গুবাক দিয়ে পূজা করবেন। এরপর গন্ধ, পুষ্প, তুলসী, ধুপ-দ্বীপ নৈবেদ্য ইত্যাদি দিয়ে পরম ভক্তিসহকারে নারায়ণের পূজা করে হরিকথা কীর্তনে সমস্ত দিন যাপন করবেন। রাত্রি জাগরণ করে অখণ্ড ঘি-প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখবেন। দ্বাদশীর দিন সূর্যোদয়ের পর সেই কলস বিসর্জনের জন্য কোন নদী, সরোবর বা জলাশয়ের কাছে গিয়ে বিধি অনুসারে পূজা নিবেদনের পরে তা বিসর্জন দেবেন। তারপর ঐ মূর্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করবেন। এই ব্রত প্রভাবে নিশ্চয়ই আপনার বিজয় লাভ হবে।

ব্রহ্মা বললেন—হে নারদ! ঋষির কথামতো ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। সীতাপ্রাপ্তি, লঙ্কাজয়, রাবণবধের মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্র অতুল কীর্তি লাভ করেছিলেন। তাই যথাবিধি যে মানুষ এই ব্রত পালন করবেন তাদের এজগতে জয়লাভ এবং পরজগতে অক্ষয় সুখ সুনিশ্চিত জানবে।

হে যুধিষ্ঠির! এই কারণে এই বিজয়া একাদশী ব্রত পালন অবশ্য কর্তব্য। এই ব্রতকথার শ্রবণ-কীর্তন মাত্রেই বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

আমলকী একাদশী

যুধিষ্ঠির বললেন—হে কৃষ্ণ! মহাফলদাতা বিজয়া একদশীর কথা শুনলাম। এখন ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী যে নামে বিখ্যাত তা বর্ণনা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহাভাগ যুধিষ্ঠির! মান্ধাতার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বশিষ্ঠ এই একদাশীর মহিমা কীর্তন করেছিলেন। আপনার কাছে এখন আমি সেই কথা বলছি।

এই একাদশীর নাম 'আমলকী'। বিষ্ণুলোক প্রদানকারী রূপে এই একাদশী বিশেষভাবে মহিমান্বিত। একাদশীর দিন আমলকী বৃক্ষের তলে রাত্রি জাগরণ করলে সহস্র গাভী দানের ফল লাভ হয়।

হে পাণ্ডুনন্দন! পূর্বে ব্রহ্মার রাত্রিতে দৈনন্দিন প্রলয় উপস্থিত হলে স্থাবর জঙ্গমসহ দেবতা, অসুর ও রাক্ষস সবকিছুর বিনাশ হয়। তখন ভগবান সেই কারণসমুদ্রে অবস্থান করেন। তাঁর মুখপদ্ম থেকে চন্দ্রবর্ণের একবিন্দু জল ভূমিতে পড়ে। সেই জলবিন্দু থেকে একটি বিশাল আমলকী বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষের স্মরণ মাত্র গো-দানের ফল, দর্শনে তাহার দ্বিগুণ এবং এর ফলভক্ষণে তিনগুণ ফল লাভ হয়। এই বৃক্ষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর সর্বদা অবস্থান করেন। এর প্রতিটি শাখা-প্রশাখা ও পাতায় ঋষি, দেবতা, ও প্রজাপতিগণ বাস করেন। এই বৃক্ষকে সমস্ত বৃক্ষের আদি বলা হয় এবং তা পরম বৈষ্ণব রূপে বিখ্যাত। অতএব এই শ্রেষ্ঠ ব্রত সকলেরই পালনীয়। এখন এই ব্রতের একটি অদ্ভুত ইতিহাস আপনার কাছে বর্ণনা করছি।

প্রাচীনকালে 'বৈদিশ' নামে এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল। এই নগরে 'চৈত্ররথ' নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। চন্দ্রবংশীয় পাশবিন্দুক রাজার পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিমান ও ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞানেও তিনি ছিলেন সুনিপুন। তার রাজ্যের সর্বত্রই মনোরম আনন্দপূর্ণ এক দিব্য পরিবেশ লক্ষ্য করা যেত।

প্রজারা ছিলেন বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ। সকলেই একাদশী ব্রত পালন করতেন। তার রাজ্যে কোন অভাব অমঙ্গল ছিল না। এইভাবে প্রজাদের নিয়ে রাজা চৈত্ররথ সুখে দিনযাপন করতে থাকেন।

একসময় ফাল্গুনী শুক্লপক্ষের দ্বাদশীযুক্তা আমলকী একাদশী তিথি সমাগত হওয়ায় রাজ্যের সকলেই এই ব্রত পালনের সংকল্প করলেন। ঐদিন প্রাতঃ স্নানের পর প্রজাদের নিয়ে রাজা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরে যান। সেখানে সুবাসিত জলপূর্ণ কলস, ছত্র, বস্ত্র, পাদুকা, পঞ্চরত্ন ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে স্থাপন করেন। তারপর ধূপ-দীপ দিয়ে যত্ন সহকারে মুনি-ঋষিদের দ্বারা শ্রীপরশুরাম মূর্তি সমন্বিত আমলকীর পূজা করেন। 'হে পরশুরাম! হে রেণুকার সুখবর্ধক! হে ধাত্রি! হে পাপবিনাশিনী আমলকী! তোমাকে প্রণাম। আমার অর্ঘ্যজল গ্রহণ কর।' এইভাবে দিনে যথাবিধি পূজা স্তবস্তুতি নৃত্যগীত করে রাজা ভক্তিভরে সেই বিষ্ণুমন্দিরে রাত্রি জাগরণ করতে লাগলেন।

এমন সময় দৈবযোগে একটি ব্যাধ সেখানে উপস্থিত হয়। পূজার সামগ্রী সহ বহু ব্যক্তিকে একত্রে রাত্রি জাগরণ করতে দেখে সে কৌতূহলাক্রান্ত হল। সে ভাবল—এসব কি ব্যাপার? বিষ্ণু মন্দিরে প্রবেশ করে সে বসে পড়ল। কলসের উপরে স্থাপিত বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করল। ভগবান বিষ্ণু এবং একাদশীর মাহাত্ম্যও সে মনোযোগ দিয়ে শুনল। সারাদিন ঐ ব্যাধ কিছুই আহার করেনি। এইভাবে ক্ষুধায় কাতর হয়ে সেখানে সে রাত্রি জাগরণ করল।

পরদিন প্রজাসহ রাজা নগরের দিকে যাত্রা করলেন। সেই ব্যাধও তার গৃহে ফিরে গেল। এরপর একসময় ব্যাধের মৃত্যু হল। একাদশীতে রাত্রি জাগরণ ব্রত প্রভাবে সেই ব্যাধ পরবর্তী জন্মে এক রাজ্যের অধীশ্বর রূপে নিযুক্ত হল।

জয়ন্তী নামে এক নগরী ছিল। সেখানে বিদূরথ নামে এক রাজা বাস করতেন। ঐ ব্যাধ বিদূরথ রাজার মহাবলী পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ

করেন। তার নাম হয় বসুরথ। এক লক্ষ গ্রামের আধিপত্য তিনি লাভ করলেন। তিনি ছিলেন সূর্যের মতো তেজস্বী, চন্দ্রের মতো কান্তিমান ও পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল। বিভিন্ন সদ্‌গুণে ভূষিত বসুরথ পরম বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হন।

এই মহাদাতা রাজা একবার শিকার করতে গিয়ে পথ ভুলে যান। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে তিনি ক্লান্তিবশতঃ শুয়ে পড়েন। এমন সময় কতগুলি পর্বতনিবাসী ম্লেচ্ছ রাজার কাছে এসে নানাভাবে উৎপীড়ন করতে থাকে। রাজাকে তাদের শত্রু মনে করে তারা তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে। "পূর্বে এই রাজা আমাদের পিতা-মাতা, পুত্র-পৌত্র সবাইকে মেরে ফেলেছে। আমাদের গৃহছাড়া করেছে।"—এইরকম বলতে বলতে ম্লেচ্ছরা রাজাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তারা বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্রে তাঁকে আঘাত করতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাজার কোন ক্ষতিই তারা সাধন করতে পারেনি। তখন রাজার শরীর থেকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী মূর্তি আবির্ভূতা হন। মহাশক্তিধারিনী ঐ নারী অল্প সময়ের মধ্যেই সকল পাপী ম্লেচ্ছকে নিধন করল। রাজার নিদ্রাভঙ্গ হল। এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড দেখে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।

তিনি বলতে লাগলেন—আহা! আমার শত্রুদের হত্যা করে কে আমার প্রাণ রক্ষা করল, এমন কৃপালু কে আছে? আমি তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এমন সময়ে দৈববাণী হল—ভগবান কেশব ব্যতীত শরণাগতকে রক্ষা করবার আর কে আছে? তিনিই শরণাগত পালক। দৈববাণী শুনে তিনি ভক্তিযুক্ত চিত্তে গৃহে ফিরে এলেন। তারপর প্রজাসহ মহাসুখে ইন্দ্রের মতো নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন।

বশিষ্ঠ বললেন—হে রাজন! যে মানুষ এই পরম-উত্তম আমলকী একাদশী ব্রত পালন করেন তিনি নিঃসন্দেহে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।

পাপমোচনী একাদশী

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে জনার্দন! চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম ও মাহাত্ম্য কৃপা করে আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির! আপনি ধর্মবিষয়ক প্রশ্ন করেছেন। এই একাদশী সকল সুখের আধার, সিদ্ধি প্রদানকারী ও পরম মঙ্গলময়। সমস্ত পাপ থেকে নিস্তার বা মোচন করে বলে এই পবিত্র একাদশী তিথি 'পাপমোচিনী' নামে প্রসিদ্ধ। রাজা মান্ধাতা একবার লোমশ মুনিকে এই একাদশীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁর বর্ণিত সেই বিচিত্র উপাখ্যানটি আপনার কাছে বলছি। আপনি মনযোগ দিয়ে তা শ্রবণ করুন।

প্রাচীনকালে অতি মনোরম 'চৈত্ররথ' পুষ্প উদ্যানে মুনিগণ বহু বছর ধরে তপস্যা করতেন। একসময় মেধাবী নামে এক ঋষিকুমার সেখানে তপস্যা করছিলেন। মঞ্জুঘোষা নামে এক সুন্দরী অপ্সরা তাঁকে বশীভূত করতে চাইল। কিন্তু ঋষির অভিশাপের ভয়ে সে আশ্রমের দুই মাইল দূরে অবস্থান করতে লাগল। বীণা বাজিয়ে মধুর স্বরে সে গান করত। একদিন মঞ্জুঘোষা মেধাবীকে দেখে কামবাণে পীড়িতা হয়ে পড়ে। এদিকে ঋষি মেধাবীও অপ্সরার অনুপম সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। তখন সেই অপ্সরা মুনিকে নানা হাব-ভাব ও কটাক্ষ দ্বারা বশীভূত করে। ক্রমে কামপরবশ মুনি সাধন-ভজন বিসর্জন দিয়ে তার আরাধ্য দেবকে বিস্মৃত হন। এইভাবে অপ্সরার সাথে কামক্রীড়ায় মুনির বহু বছর অতিক্রান্ত হল।

মুনিকে আচার-ভ্রষ্ট দেখে সেই অপ্সরা দেবলোকে ফিরে যেতে মনস্থ করল। একদিন মঞ্জুঘোষা মেধাবী মুনিকে বলতে লাগল—হে প্রভু, এখন আমাকে নিজ গৃহে ফিরে যাবার অনুমতি প্রদান করুন। কিন্তু মেধাবী বললেন—হে সুন্দরী! তুমি তো এখন সন্ধ্যাকালে আমার কাছে এসেছ, প্রাতঃকাল পর্যন্ত আমার কাছে থেকে যাও। মুনির কথা শুনে অভিশাপ ভয়ে সেই অপ্সরা আরও কয়েক বছর তার সাথে বাস

করল। এইভাবে বহুবছর (৫৫ বছর ৯ মাস ৭ দিন) অতিবাহিত হল। দীর্ঘকাল অপ্সরার সহবাসে থাকলেও মেধাবীর কাছে তা অর্ধরাত্রি বলে মনে হল। মঞ্জুঘোষা পুনরায় নিজস্থানে গমনের প্রার্থনা জানালে মুনি বললেন—এখন প্রাতঃকাল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্ধ্যাবন্দনা না সমাপ্ত করি, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এখানে থাক।

মুনির কথা শুনে ঈষৎ হেসে মঞ্জুঘোষা তাকে বলল—হে মুনিবর! আমার সহবাসে আপনার যে কত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, তা একবার বিচার করে দেখুন।, এই কথা শুনে মুনি স্থির হয়ে চিন্তা করে দেখলেন যে, তাঁর ছাপ্পান্ন বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

মুনি তখন মঞ্জুঘোষার প্রতি ক্রোধ পরবশ হয়ে বললেন—রে পাপীষ্ঠে, দুরাচারিণী, তপস্যার ক্ষয়কারি ।, তোমাকে ধিক্! তুমি পিশাচী হও। মেধাবীর শাপে অপ্সরার শরীর বিরূপ প্রাপ্ত হল। তখন সে অবনতমস্তকে মুনির কাছে শাপমোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করল।

মেধাবী বললেন—হে সুন্দরী! চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া পাপমোচনী একাদশী, সর্বপাপ ক্ষয়কারিণী। সেই ব্রত পালনে তোমার পিশাচত্ব দূর হবে।

পিতার আশ্রমে ফিরে গিয়ে মেধাবী বললেন—হে পিতা! এক অপ্সরার সঙ্গদোষে আমি মহাপাপ করেছি, এর প্রায়শ্চিত্ত কি? তা কৃপা করে আমায় বলুন।

উত্তরে চ্যবন মুনি বললেন—চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া পাপমোচনী একাদশী ব্রতের প্রভাবে তোমার পাপ দূর হবে। পিতার উপদেশ শুনে মেধাবী সেই ব্রত ভক্তিভরে পালন করল। তার সমস্ত পাপ দূর হল। পুণরায় তিনি তপস্যার ফল লাভ করলেন। মঞ্জুঘোষাও ঐ ব্রত পালনের ফলে পিশাচত্ব থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য দেহে স্বর্গে গমন করল।

হে মহারাজ! যারা এই পাপমোচনী একাদশী পালন করেন, তাদের পূর্বকৃত সমস্ত পাপই ক্ষয় হয়। এই ব্রতকথা পাঠ ও শ্রবণে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

কামদা একাদশী

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের 'কামদা' একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য বরাহপুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে বাসুদেব! আপনি কৃপা করে আমার কাছে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর মহিমা কীর্তন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহারাজ! এই একাদশী ব্রত সম্পর্কে এক বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করছি। আপনি একমনে তা শ্রবণ করুন। পূর্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ মহারাজ দিলীপের কৌতুহল নিবারণের জন্য এই ব্রতকথা কীর্তন করেছিলেন।

ঋষি বশিষ্ঠ বললেন—হে মহারাজ! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম 'কামদা'। এই তিথি পাপনাশক ও পুণ্যদায়িনী। পূর্বকালে মনোরম নাগপুরে স্বর্ণনির্মিত গৃহে বিষধর নাগেরা বাস করত। তাদের রাজা ছিলেন পুণ্ডরীক। গন্ধর্ব, কিন্নর ও অপ্সরাদের দ্বারা তিনি সেবিত হতেন। সেই পুরীমধ্যে অপ্সরা শ্রেষ্ঠ ললিতা ও ললিত নামে গন্ধর্ব স্বামী-স্ত্রী রূপে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ এক গৃহে পরমসুখে দিনযাপন করত।

একদিন পুণ্ডরীকের রাজসভায় ললিত একা গান করছিল। এমন সময় ললিতার কথা তার মনে পড়ল। ফলে সঙ্গীতের স্বর-লয়-তাল-মানের বিপর্যয় ঘটল। কর্কটক নামে এক নাগ ললিতের মনোভাব বুঝতে পারল। গানের ছন্দভঙ্গের ব্যাপারটি সে পুণ্ডরীক রাজার কাছে জানাল। তা শুনে সর্পরাজ ক্রোধভরে কামাতুর ললিতকে—'রে দুর্মতি! তুমি রাক্ষস হও' বলে অভিশাপ দান করল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ললিত ভয়ঙ্কর রাক্ষসমূর্তি ধারণ করল। তার হাত দশ যোজন বিস্তৃত, মুখ পর্বত গুহাতুল্য, চোখ দুটি প্রজ্বলিত আগুনের মতো, উর্ধ্বে আট যোজন বিস্তৃত প্রকাণ্ড এক শরীর সে লাভ করল। ললিতের এরকম ভয়ঙ্কর রাক্ষস শরীর দেখে ললিতা মহাদুঃখে চিন্তায় ব্যাকুল হলেন। স্বেচ্ছাচারী রাক্ষস ললিত দুর্গম বনে ভ্রমণ করতে লাগল। ললিতা

কিন্তু তার সঙ্গ ত্যাগ করল না। ললিত নির্দয়ভাবে মানুষ ভক্ষণ করত। এই পাপের ফলে তার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। পতির সেই দুরাবস্থা দেখে ব্যথিত চিত্তে রোদন করতে করতে ললিতা গভীর বনে প্রবেশ করল।

একদিন ললিতা বিন্ধ্যপর্বতে উপস্থিত হল। সেখানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম দর্শন করে মুনির কাছে হাজির হল। তার চরণে প্রণাম করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। মুনিবর জিজ্ঞাসা করলেন—হে সুন্দরী! তুমি কে, কার কন্যা, কি কারণেই বা এই গভীর বনে এসেছ? তা সত্য করে বল। তদুত্তরে ললিতা বলল—হে প্রভু! আমি বীরধন্যা গন্ধর্বের কন্যা। আমার নাম ললিতা। আমার পতির পিশাচত্ব দূর হয় এমন কোন উপায় জানবার জন্য এখানে এসেছি।

তখন ঋষি বললেন—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের কামদা নামে যে একাদশী আছে, তুমি সেই ব্রত যথাবিধি পালন কর। এই ব্রতের পুণ্যফল তোমার স্বামীকে অর্পণ করলে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হবে।

বশিষ্ঠ ঋষি বললেন—হে মহারাজ দিলীপ! মুনির কথা শুনে ললিতা আনন্দ সহকারে কামদা একাদশী পালন করল। তারপর ব্রাহ্মণ ও বাসুদেবের সামনে পতির উদ্ধারের জন্য—'আমি যে কামদা একাদশীর ব্রত পালন করেছি, তার সমস্ত ফল আমার পতির উদ্দেশ্যে অর্পণ করলাম। এই পুণ্যের প্রভাবে তাঁর পিশাচত্ব দূর হোক।' এই কথা উচ্চারণ মাত্রই ললিত শাপ মুক্ত হয়ে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হল। পুনরায় গন্ধর্ব দেহ লাভ করে ললিতার সাথে সে মিলিত হল। তারা বিমানে করে গন্ধর্বলোকে গমন করল।

হে মহারাজ দিলীপ এই ব্রত যত্নসহকারে সকলেরই পালন করা কর্তব্য। এই ব্রত ব্রহ্মহত্যা পাপবিনাশক এবং পিশাচত্ব মোচনকারী। এই ব্রত কথা শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ ও শ্রবণে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

পদ্মিনী একাদশী

স্মার্তগণ পুরুষোত্তম মাস বা অধিমাসকে 'মলমাস' বলে এই মাসে সমস্ত শুভকার্য পরিত্যাগ করে থাকেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মাসকে পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য অন্য সকল মাস থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে নির্ণয় করেছেন। তিনি নিজের নামানুসারে এই মাসের নাম 'পুরুষোত্তম' মাস রেখেছেন।

যুধিষ্ঠির বললেন—হে জনার্দন! আমি বহুধর্ম ও ব্রতের কথা শুনেছি। এখন পুরুষোত্তম মাসের সর্বপাপবিনাশিনী ও পুণ্যদায়িনী শুক্লপক্ষীয়া 'পদ্মিনী' একাদশীর কথা আমার কাছে বর্ণনা করুন—যা শ্রবণ করলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—দশমীর দিন থেকেই ব্রতের শুরু হয়। কাঁসার পাত্রে ভোজন, মসুর, ছোলা, শাক এবং অপরের অন্ন ও আমিষ দশমীর দিন বর্জন করতে হয়। পরের দিন প্রাতঃকৃত্যের পর সুগন্ধী ধূপ, দীপ, চন্দনাদি দিয়ে ভগবানের পূজা করতে হয়। রাত্রিতে জাগ্রত থেকে ভগবানের নাম, গুণ কীর্তন করতে হয়। এখন এই ব্রতের একটি ইতিহাস আপনার মনোরঞ্জনের জন্য বলছি। পূর্বে পুলস্ত মুনি দেবর্ষি নারদকে এই ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন।

একসময় রাজা কার্তবীর্য লঙ্কাপতি রাবণকে পরাজিত করে তাঁর কারাগারে বন্দী করে রাখে। পুলস্ত মুনি রাজার কাছে রাবণের মুক্তি প্রার্থনা করেন। মুনির আজ্ঞায় রাজা রাবণকে মুক্ত করে দেন। এই আশ্চর্যজনক কথা শুনে নারদ পুলস্ত মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন—হে মুনিবর! ইন্দ্রসহ সকল দেবতা যেখানে রাবণের কাছে পরাজিত হয়েছিল সেখানে কিভাবে কার্তবীর্য রাবণকে পরাজিত করল? কৃপা করে তা বলুন। পুলস্ত মুনি তখন নারদের কাছে কার্তবীর্যের জন্ম রহস্য বর্ণনা করেন।

ত্রেতাযুগে হৈহয় বংশে কৃতবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন। মহিষ্মতীপুরে তার রাজধানী ছিল। রাজার এক হাজার পত্নী ছিল। কিন্তু রাজ্যভার গ্রহণের মতো কোন পুত্র লাভ রাজার ভাগ্যে হয়নি। দেবতাদের আরাধনাতেও সুফল মেলেনি তার। অবশেষে সাধুদের আজ্ঞানুসারে বিভিন্ন ব্রত পালন করলেন। তথাপি রাজা ছিলেন অপুত্রক। মন্ত্রীর ওপর রাজ্যভার অর্পণ করে তপস্যায় যাবেন বলে স্থির করলেন রাজা কৃতবীর্য। রাণী মহারাজ হরিশচন্দ্রের কন্যা পদ্মিনী ছিলেন অত্যন্ত পতিব্রতা। স্বামীর সঙ্গে তিনিও তপস্যার জন্য মন্দার পর্বতে গমন করলেন। সেখানে তারা দশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করলেন। কিন্তু তবুও কৃতবীর্য পুত্রসুখে বঞ্চিতই রইলেন।

রাণী পদ্মিনী মহাসাধ্বী অনুসূয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে সাধ্বী! পুত্র লাভের জন্য আমার স্বামী দশ হাজার বছর তপস্যা করেও বিফল হয়েছে। এখন যে ব্রত পালনে ভগবান প্রসন্ন হন এবং অতিশ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ হয়, এমন কোন উপায় বিধান করুন।

পদ্মিনীর প্রার্থনায় অনুসূয়া প্রসন্ন হয়ে বললেন—বত্রিশ মাস অন্তরে এক অধিমাস বা পুরুষোত্তম মাস আসে। এই মাসে পদ্মিনী ও পরমা দুই একাদশী। এই ব্রত পালন করলে পুত্রদাতা ভগবান শীঘ্রই প্রসন্ন হবেন।

অনুসূয়ার নির্দেশে পদ্মিনী পরম শ্রদ্ধায় এই একাদশী ব্রত পালন করলেন। সেই ব্রতে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং ভগবান গরুড় বাহনে আরোহন করে পদ্মিনীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

ভগবান বললেন—হে ভদ্রে! আমি প্রসন্ন হয়েছি। পুরুষোত্তম মাসের সমান কোন মাস আমার প্রিয় নয়। এই মাসের একাদশী আমার পরম প্রিয়। তুমি সেই ব্রত যথাযথ পালন করেছ। তাই আমি তোমার ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করব।

ভগবানের স্তব করে রাণী বললেন—হে ভগবান! আমার স্বামীকে আপনি বরদান করুন। ভগবান তখন রাজার কাছে এসে বললেন—হে রাজেন্দ্র! আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন। মহানন্দে রাজা বললেন—হে জগৎপতি, মধুসূদন! দেবতা, মানুষ, নাগ, দৈত্য, রাক্ষস আদি কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না, এমন পুত্র আমি প্রার্থনা করি। রাজার প্রার্থনা অনুসারে বরদান করে ভগবান অন্তর্হিত হলেন। রাজা পত্নীসহ নগরে ফিরে এলেন। যথাসময়ে রাণী পদ্মিনীর গর্ভে মহাবলশালী এক পুত্রের জন্ম হয়। মহারাজ কৃতবীর্য পুত্রের নাম রাখেন কার্তবীর্য। ত্রিলোকে তার সমান কোন বীর ছিল না। তাই দশানন রাবণ যুদ্ধে তার কাছে পরাজিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে মহারাজ! এই ব্রত যিনি পালন করবেন, তিনি ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি লাভ করবেন।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে ধর্মরাজ সপরিবারে এই একাদশী ব্রত পালন করেন। যিনি এই ব্রত মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করেন তিনি বহু পুণ্য লাভ করেন।

পরমা একাদশী

মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন—হে কৃষ্ণ! পুরষোত্তম মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম কি এবং এর বিধিই বা কি? দয়া করে আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে যুধিষ্ঠির! সুখভোগ, মুক্তি, আনন্দ প্রদানকারী, পবিত্র এবং পাপবিনাশিনী এই একাদশীব নাম 'পরমা'। পূর্বে বর্ণিত একাদশীর বিধি অনুসারেই এই ব্রত পালন করা কর্তব্য। এখন এই ব্রত বিষয়ে এক মনোহর কাহিনী তোমাকে বলব। কাম্পিল্য নগরে মুনিঋষিদের কাছে আমি তা শুনেছিলাম।

কাম্পিল্য নগরে সুমেধা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল পবিত্রা। তিনি অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন। কিন্তু পূর্ব কর্মফলে এই ব্রাহ্মণ ধনহীন হয়ে পড়েন। ভিক্ষা চেয়েও তার কিছুই জুটত না। কিন্তু তাঁর স্ত্রী নিজ পতির সেবা নিষ্ঠা সহকারে করতেন। গৃহে অতিথিসেবার জন্য প্রয়োজনে অনাহারে থাকতেন। স্বামীকে কখনও বলতেন না যে গৃহে অন্ন নেই। পত্নীর শারিরীক দুরাবস্থার কথা চিন্তা করে ব্রাহ্মণ নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতেন।

একদিন পত্নী প্রিয়ংবদাকে বললেন—হে কান্তে! আমি ধনবান মানুষদের কাছেও ভিক্ষা চেয়ে পাই না। বলো এখন আমি কি করব? ধন সংগ্রহের জন্য আমি অন্য কোথাও যেতে চাই। তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

ব্রাহ্মণপত্নী তখন তাঁকে বললেন—হে বিদ্বান! এজগতে মানুষ তার পূর্বসঞ্চিত ফল ভোগ করে। পূর্বজন্মের কোন ফল না থাকলে স্বর্ণপর্বতে গেলেও কিছু পাওয়া যাবে না। হে স্বামী, পূর্বজন্মে আমি অথবা আপনি কেউই ধনসম্পদ ইত্যাদি কোন কিছুই সৎপাত্রে দান করিনি। তাই আমাদের ভাগ্যে যা আছে তা এখানে থেকেই লাভ হবে। আপনাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারব না। কেননা

পতীহীনাকে দুর্ভাগা বলে সবাই তখন নিন্দা করবে। অতএব এখানে যা ধন লাভ হয় তা দিয়ে দিনযাপন করুন।

ঐ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ, পত্নীর কথা শুনে ঐ নগরেই রইলেন। একদিন মুনিশ্রেষ্ঠ কৌণ্ডিন্য সেখানে এলেন। তাঁকে দেখে সুমেধা খুব খুশি হলেন। ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক মুনিকে প্রণাম জানালেন। সুন্দর আসন দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। ঐ দম্পতি আনন্দ সহকারে মুনিকে ভোজন করালেন। এরপর ব্রাহ্মণপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন—হে মুনিবর! কিভাবে দারিদ্রতা নাশ হয়? বিনা দানে কিভাবে ধন, বিদ্যা, স্ত্রী লাভ হয়? আমার স্বামী আমাকে এখানে রেখে ভিক্ষার জন্য দূর দেশে যেতে চান। কিন্তু আমি তাঁকে যেতে নিষেধ করেছি। এখন আমাদের ভাগ্যবশে এখানে আপনার শুভাগমন হয়েছে। আপনার কৃপায় আমাদের দারিদ্রতা অবশ্যই নাশ হবে। দারিদ্রতা বিনষ্ট হয় এমন কোন ব্রত বা তপস্যার কথা আপনি কৃপা করে আমাদের বলুন।

এই কথা শুনে মুনিবর বললেন—হে সাধ্বী! পুরুষোত্তম মাসের কৃষ্ণপক্ষে 'পরমা' নামে সর্বশ্রেষ্ঠা এক একাদশী আছে। এই তিথি ভগবানের অতিব প্রিয়তমা। এই ব্রত পালনে মানুষ অন্ন, ধনসম্পদ আদি সবই লাভ করে থাকে। এই সুন্দর ব্রত ধনপতি কুবের প্রথম করেছিলেন। রাজা হরিশচন্দ্রও এই ব্রত পালনে স্ত্রী-পুত্র ও রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন। হে বিশালাক্ষী! এই জন্য তোমরাও এই ব্রত পালন কর।

হে পাণ্ডব! কৌণ্ডিন্য মুনির উপদেশে পতি-পত্নী উভয়ে একসঙ্গে বিধিমতো পুরুষোত্তম মাসের পরমা একাদশী ব্রত পালন করলেন। ব্রত সমাপনের পর রাজভবন থেকে এক রাজকুমার তাঁদের কাছে এলেন। ব্রহ্মার প্রেরণায় তিনি বহু ধনসম্পদ, নতুন গৃহ ও গাভী এই দম্পতিকে দান করলেন। এই দানের ফলে মৃত্যুর পর সেই রাজা বিষ্ণুলোক

প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে পরমা ব্রতের প্রভাবে ব্রাহ্মণ-দম্পতির সকল দুঃখের অবসান হল।

যে মানুষ এই একাদশী ব্রত পালন না করেন তিনি চুড়াশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করেও কখনও সুখী হয় না। বহু পুণ্য কর্মের ফলে দুর্লভ মানব-জন্ম লাভ হয়। তাই মানব-জীবনে এই একাদশী ব্রত পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এই মাহাত্ম্য শুনে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর আত্মীয়বর্গের সঙ্গে এই ব্রত পালন করেছিলেন।

অষ্ট মহাদ্বাদশী

একাদশী ব্রত প্রসঙ্গে আটটি মহাদ্বাদশী ব্রত সম্পর্কেও আমাদের বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীসূত-শৌনক সংবাদে অষ্ট মহাদ্বাদশীর কথা বলা হয়েছে—

উন্মীলনী বঞ্জুলী ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী ।
জয়া বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥
দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ ।
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চাপরাস্তথা ।
নক্ষত্রযোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৩/১০৬-১০৭)

হে ব্রাহ্মণ! উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—এই আটটি দ্বাদশী পরম পবিত্রা ও সর্বপাপহারিনী। এর মধ্যে চারটি দ্বাদশী তিথিযোগে এবং অবশিষ্ট চারটি নক্ষত্রযোগে আবির্ভূত হয়। এই সকল দ্বাদশী সর্বপাপ বিনাশ করে। ধর্মস্বরূপ সাক্ষাৎ শ্রীহরি একাদশী রূপে বিরাজ করেন। ব্যঞ্জুলী ও উন্মীলনী ব্রত তাঁর শরীরের মতো বলা হয়। পদ্মপুরাণ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণে বলা হয়েছে যে, যারা এই দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করে না, দেহান্তে তারা যমপুরীতে বাস করে। তাই আত্মকল্যাণ লাভের জন্য প্রত্যেকের কর্তব্য একাদশী তথা মহাদ্বাদশী তিথিগুলি যত্নসহকারে পালন করা। এর ফলে অবাঞ্ছিত দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ ও আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়। এছাড়াও হরিভক্তিবিলাসে শ্রাবণ দ্বাদশী এবং গোবিন্দ দ্বাদশী নামে আরও দুইটি দ্বাদশী ব্রতের উল্লেখ রয়েছে।

উন্মীলনী মহাদ্বাদশী

একাদশী সম্পূর্ণ হয়ে পরের দিন দ্বাদশীতে কলামাত্র বৃদ্ধি পেলে অথচ দ্বাদশীর পরের দিন বৃদ্ধি না পেলে তাকে উন্মীলনী দ্বাদশী বলা

হয়। এরকম হলে দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করে ত্রয়োদশীতে পারণ করতে হবে। পদ্মপুরাণে এই মহাদ্বাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

একসময় অম্বরীশ মহারাজের রাজভবনে গৌতম মুনি উপস্থিত হলে, রাজা প্রফুল্লচিত্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! কর্মবন্ধন মোচন ও বৈকুণ্ঠগতি লাভ হয়, এমন কোন বৈষ্ণব ব্রতের কথা কৃপা করে আমাকে উপদেশ করুন।

উত্তরে গৌতম ঋষি বললেন—হে রাজন! পূর্বে ভগবান শ্রীবিষ্ণু আমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং উন্মীলনী ব্রতের উপদেশ করেছিলেন। সেই ব্রত কথা আমি এখন আপনার কাছে বলছি। ত্রিভুবনের সকল তীর্থ, যজ্ঞ, বেদ ও তপস্যা এই ব্রতের কোটি অংশের এক অংশের সমান নয়। যে মাসে উন্মীলনী তিথির আবির্ভাব হয়, সেই মাসে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে যথাবিধি মধুসূদনের পূজা করতে হবে।

হে দেবেশ! হে পুণ্যকীর্তি আপনাকে প্রণাম। আমাকে শোকমোহ ও মহাপাপরূপ সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করুন। আমি শতজন্মে কিঞ্চিৎ পুণ্যও করিনি। তবুও হে জগন্নাথ! আমাকে ভবসাগর থেকে উদ্ধার করুন। আপনার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি প্রদান করুন। কৃপা করে আমার নিবেদিত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। এইভাবে অর্ঘ্য প্রদান করে নৈবেদ্য, স্তব-স্তুতি, আরতি-কীর্তনে ভগবানের প্রীতিসাধন করতে হয়।

এইভাবে অনুষ্ঠিত ব্রতের প্রভাবে ব্রতকারী ধনবান, বিদ্বান, দীর্ঘায়ু ও পুত্রবান হন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বলা হয়েছে যে, এই ব্রতে দান, হোম প্রভৃতি সবই অক্ষয় হয়ে থাকে। এই ব্রত অনুষ্ঠান না করা হলে মানুষকে যমযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়।

ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী

সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে একাদশী পূর্ণ হলে এবং দ্বাদশীও পূর্ণ হয়ে তার পরের দিন ত্রয়োদশীতে কিছু অংশ থাকলে ঐ দ্বাদশীকে

'ব্যঞ্জুলী' বলা হয়। এক্ষেত্রে একাদশী না করে ঐ দ্বাদশীতেই উপবাস করতে হবে। পরের দিন দ্বাদশীর মধ্যেই পারণ করতে হবে। ত্রয়োদশীতে পারণ নিষেধ।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে এই দ্বাদশী ব্রত শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। একটি অশ্বমেধ যজ্ঞ এক হাজার অগ্নিষ্টোম থেকে শ্রেষ্ঠ। আবার একটি বাজপেয় এক হাজার অশ্বমেধ থেকে আরও বেশী শ্রেষ্ঠ। একটি পুণ্ডরীক এক হাজার বাজপেয় থেকে অধিক ফলবিশিষ্ট। একটি সৌত্রামণি সহস্র পুণ্ডরীক থেকে শ্রেষ্ঠ। একটি রাজসূয় এক হাজার সৌত্রামণির চাইতেওশ্রেষ্ঠ। কিন্তু একটি ব্যঞ্জুলী ব্রত সহস্র রাজসূয় অপেক্ষাও অধিকতর শ্রেষ্ঠ। কলিকালে 'ব্যঞ্জুলী' এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রই শতসহস্র জন্মের পাপক্ষয় হয়ে যায়।

শ্রীগুরুদেব খুশি হলে শ্রীহরিও প্রীত হন। অতএব এই তিথিতে শ্রীহরির প্রীতির জন্য শ্রদ্ধাসহকারে গুরুদেবের পূজা করতে হবে। রাত্রি জাগরণ করে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে হবে। গীতা, বিষ্ণু সহস্র নাম ও শ্রীমদ্ভাগবত যত্নসহকারে পাঠ করা কর্তব্য। নৃত্য, গীত ও সংকীর্তনে শ্রীহরি পরম সন্তুষ্ট হন। এই ব্রত অনুষ্ঠানে সর্বতীর্থে স্নান ও সমস্ত প্রকার দানের ফল লাভ হয়। পূর্ব জন্মার্জিত পর্বত প্রমাণ পাপরাশি এই ব্রত পালনে অচিরেই বিনষ্ট হয়।

ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী

প্রথমে একাদশী তারপর সমস্ত দিন দ্বাদশী এবং রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী হলে তা 'ত্রিস্পৃশা' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। শ্রীহরির বিশেষ প্রিয় এই মহাপুণ্য তিথিতে সযত্নে উপবাস করা কর্তব্য। এই ব্রতের পারণ ত্রয়োদশীতে করতে হয়।

পদ্মপুরাণে শ্রীসনৎকুমার-বেদব্যাস সংবাদে এই ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। সনৎ কুমার বললেন—সর্বপাপবিনাশিনী এই ত্রিস্পৃশা মহাব্রত সকলেরই পালন করা উচিত। চক্রধারী ভগবান বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্রে শিব, ব্রহ্মা ও আমার কাছে এই ব্রত সম্পর্কে বলেছিলেন। জড় বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিও যদি এই ব্রত পালন করে, তবে তারা মুক্তিলাভের যোগ্য হয়। হে মুনিবর! বারাণসীতে ও প্রয়াগে মৃত্যু হলে এবং গোমতীতে স্নান করলে মানুষের মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু ত্রিস্পৃশা ব্রতে কেবল উপবাস ফলেই গৃহে থেকে এই মুক্তি লাভ হয়।

একসময় শ্রীজাহ্নবী ভগবান মাধবের কাছে এসে বললেন---হে হৃষীকেশ! কলিযুগের মহাপাপী মানুষ যখন আমার জলে স্নান করবে, সেই পাপে আমি কলুষিত হয়ে পড়ব। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? শ্রীমাধব বললেন---হে গঙ্গে! সর্বকলুষ বিনাশী এই ত্রিস্পৃশা ব্রত তুমি পালন কর। ভগবানের নির্দেশে গঙ্গাদেবী এই ত্রিস্পৃশা ব্রত পালন করে কলির কলুষ থেকে মুক্ত হন। হে মুনিবর! বিষয় অনুরাগী ব্যক্তি কিংবা বিষয় অনাসক্ত, উভয়ের পক্ষে মুক্তি লাভ করা কঠিন। তাই মুক্তিদানকারী এই ত্রিস্পৃশা ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

পক্ষবর্ধিনী মহাদ্বাদশী

অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমা সম্পূর্ণ হয়ে প্রতিপদে কিছুমাত্র থাকলে তার পূর্বের দ্বাদশী তিথির নাম 'পক্ষবর্ধিনী'। এই অবস্থায় একাদশীর দিন উপবাস না করে দ্বাদশীতেই উপবাস করতে হয়। অনন্ত কলুষ বিনাশকারী এই দ্বাদশী পরিত্যাগকারীকে বহু বছর নরকে বাস করতে হয়। যে মাসে পক্ষবর্ধিনী হয়, শ্রীহরির সেই মাসের নাম অনুসারে তাঁকে ভক্তিসহকারে পূজা করতে হয়।

সংসারার্ণবপোতায় পাপকক্ষামহানল ।
নরকাগ্নিপ্রশমন জন্মমৃত্যুজরাপহ ॥
মামুদ্ধর জগন্নাথ পতিতং ভবসাগরে ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পদ্মনাভ নমোহস্তু তে ॥"

'হে জগন্নাথ! আপনি এই সংসার সমুদ্রের নৌকাস্বরূপ পাপরূপ তৃণের জন্য মহা অনল, নরক অগ্নির প্রশমনকারী, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির মোচনকারী। তাই ভবসাগরে পতিত আমাকে আপনি কৃপা করে উদ্ধার করুন। হে পদ্মনাভ! আমার নিবেদিত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। আপনাকে আমি প্রণাম জানাই।' এইভাবে শ্রীহরিকে অর্ঘ্য নিবেদন করে নৈবেদ্য ও সুস্বাদু ফলমূল অর্পণ করতে হয়। নিজ সামর্থ মতো যত্ন সহকারে শ্রীহরির গুণকীর্তন ও রাত্রিজাগরণে এই ব্রত পালন করতে হয়। এই ব্রত পালনে দশ হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়ে থাকে।

জয়া মহাদ্বাদশী

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবশিষ্ঠ-মান্ধাতা সংবাদে এই মহাদ্বাদশীর কথা বলা হয়েছে। শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে 'পুনর্বসু' নক্ষত্র যুক্ত হলে তাকে সর্বোত্তমা 'জয়া' মহাদ্বাদশী বলা হয়। এই ব্রত উপবাসে ভয়ঙ্কর নরকযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ লাভ হয় এবং অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

বিজয়া মহাদ্বাদশী

শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হলে সেই মহা পবিত্র দ্বাদশীকে 'বিজয়া' বলা হয়। ভাদ্র মাসের বুধবারে বিজয়া ব্রত হলে সমস্ত ব্রত থেকে এই ব্রতের মাহাত্ম্য অধিক হয়। এই তিথি আবার শ্রবণ-মহাদ্বাদশী নামেও পরিচিত হয়। বিষ্ণুধর্মোত্তরে এই ব্রতের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই তিথিতে পবিত্র তীর্থ স্নানে সমস্ত তীর্থ-স্নানের ফল পাওয়া যায়। সারা বৎসরের পূজার ফল কেবল এই ব্রত পালনেই লাভ হয়। এই দিনে একবার মাত্র ভগবানের নাম

জপে এক হাজার বার জপের ফল অর্জিত হয়। এই তিথিতে দান, বৈষ্ণবভোজন, হোম, উপবাসে হাজার গুণ বেশি ফল লাভ হয়ে থাকে।

জয়ন্তী মহাদ্বাদশী

শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত হলে সেই পবিত্র দ্বাদশীকে 'জয়ন্তী' বলা হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত হয়েছে যে, সমস্ত পাপহরণকারী এই তিথিতে শ্রীহরির পূজাসহকারে ব্রত-উপবাসে সাত জন্মের পাপ দূর হয়ে যায়। যে মানুষ বেঁচে থাকতেও এই ব্রত পালন করে না, তার জীবন বৃথা। এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের পূজা বিশেষভাবে করতে হয়।

অবতারসহস্রাণি করোষি মধুসূদন।
ন তে সংখ্যাবতারাণাং কশ্চিজ্জানাতি বৈ ভুবি ॥
দেবা ব্রহ্মাদয়ো বাপি স্বরূপং ন বিদুস্তব।
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি মাতুরুৎসঙ্গসংস্থিতম্ ॥
বাঞ্ছিতং কুরু মে দেব দুষ্কৃতং চৈব নাশয়।
কুরুষ্ব মে দয়াং দেব সংসারার্তি-ভয়াপহ ॥

'হে মধুসূদন! আপনি অসংখ্য অবতার গ্রহণ করেন। জগতে এমন কেউ নেই যে আপনার সেসকল অবতারের গণনা করতে সমর্থ হয়। ব্রহ্মাদি দেবতাদের কাছেও আপনার স্বরূপ অজ্ঞাত। জননীর কোলে অবস্থানরত আপনাকে আমি পূজা করি। হে দেব! হে ভবভয় মোচনকারী, আমার দুষ্কৃতি নাশ ও অভীষ্ট প্রদান করে আমাকে কৃপা করুন। এইভাবে ভক্তিসহকারে জয়ন্তী মহাদ্বাদশী পালন করলে একুশ পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। শ্রীহরির অত্যন্ত প্রীতিকর এই ব্রতের অনুষ্ঠানে সকল মনোবাসনা পূর্ণ ও বিষ্ণুলোকে গতি হয়।

পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী

শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ হলে সেই দ্বাদশীকে 'পাপনাশিনী' বলা হয়। ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে, মহাপুণ্য স্বরূপিনী এই তিথিতে মহারাজ সগর, ককুৎস্থ, ধুন্ধুমার ও গাধি শ্রীহরির উপাসনা করে সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়েছিলেন। এই ব্রত উপবাসে কায়িক, বাচিক, মানসিক, সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্তা এই দ্বাদশীর উপবাসে এক হাজার একাদশীর ফল লাভ হয়ে থাকে। এই তিথিতে স্নান, দান, জপ, হোম, বেদধ্যয়ন আদি অনন্তগুণ ফল প্রদান করে। যারা কোন জাগতিক ফল অকাঙ্ক্ষা করেন না, তারা শ্রীহরির প্রীতিবিধানের জন্য এই ব্রত উপবাস পালন করবেন।

শ্রীহরিবাসরে-গীতি

(১)

শুদ্ধভকত- চরণ-রেণু,
ভজন-অনুকূল ।
ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল ॥
মাধব-তিথি ভক্তি-জননী,
যতনে পালন করি ।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি
পরম আদরে বরি ॥
গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে ।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥
মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মন
অবসর সদা যাচে ।
গৌর-বিহিত, কীর্তন শুনি
আনন্দে হৃদয় নাচে ॥
যুগলমূর্তি দেখিয়া মোর
পরম-আনন্দ হয় ।
প্রসাদ সেবা করিতে হয়
সকল প্রপঞ্চ জয় ॥
যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায় ।
চরণ-সীধু দেখিয়া গঙ্গা
সুখ না সীমা পায় ॥

তুলসী দেখি জুড়ায় প্রাণ
মাধবতোষণী জানি ।
গৌর প্রিয় শাক-সেবনে
জীবন সার্থক মানি ॥
ভকতিবিনোদ কৃষ্ণভজনে
অনুকূল পায় যাহা ।
প্রতিদিবসে পরম-সুখে
স্বীকার করয়ে তাহা ॥

(২)

শ্রীহরি-বাসরে হরি-কীর্তন বিধান ।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ ।
উঠিল কীর্তন-ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ ॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা ।
আনন্দে গায়েন কৃষ্ণরসে হই' ভোলা ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল ।
সংকীর্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥
এ কোন্ অদ্ভুত—যা'র সেবকের নৃত্য ।
সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয়, জগত পবিত্র ॥
সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে ।
ইহার কি ফল—কিবা বলিব পুরাণে? ॥
চতুর্দ্দিগে শ্রীহরি-মঙ্গল-সংকীর্তন ।
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥

যার নামানন্দে শিব, বসন না জানে ।
যার যশে নাচে শিব, সে নাচে আপনে ॥
যার নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন ।
যার নামে অজামিল পাইল মোচন ॥
যার নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে ।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে ॥
যার নাম গাই শুক-নারদ বেড়ায় ।
সহস্র-বদন-প্রভু যার গুণ গায় ॥
সর্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম ।
সে প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান্ ॥
হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, তখন না হইল ।
হেন মহা-মহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥
কলিযুগ প্রশংসিল শ্রীভাগবতে ।
এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাস-সুতে ॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর ॥
ভাব-ভরে মালা নাহি রহয়ে গলায় ।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের পায় ॥
কতি গেলা গরুড়ের আরোহণ সুখ ।
কতি গেলা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-রূপ ॥
কোথায় রহিল সুখ-অনন্ত-শয়ন ।
দাস্যভাবে ধূলি লুটি করয়ে রোদন ॥
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠে সুখভার ।
দাস্য সুখে সব সুখ পাসরিল তার ॥
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টিসুখ ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি বাহু-মুখ ॥

শঙ্কর-নারদ-আদি যার দাস্য পাইয়া।
সর্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি ভ্রমে দাস হঞা ॥
সেই প্রভু আপনার দন্তে তৃণ করি।
দাস্য-যোগ মাগে সব-সুখ পরিহরি ॥
বেদে ভাগবতে—কহে—দাস্য বড় ধন।
দাস্য লাগি রমা-অজ ভবের যতন ॥
হেন দাস্য যোগ ছাড়ি আর যেবা চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি ধায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৮৯৬ সালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলকাতায়। ১৯২২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন ভক্তিমার্গের বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং ৬৪টি গৌড়ীয় মঠের (বৈদিক সংঘ) প্রতিষ্ঠাতা। তিনি এই বুদ্ধিদীপ্ত, তেজস্বী ও শিক্ষিত যুবকটিকে বৈদিক জ্ঞান প্রচারের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এগার বছর ধরে তাঁর আনুগত্যে বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

১৯২২ সালে তাঁদের প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে অনুরোধ করেন। পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য লিখে গৌড়ীয় মঠের প্রচারের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি এককভাবে একটি ইংরাজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন এবং পত্রিকাটির পাণ্ডুলিপি টাইপ করা, প্রুফ সংশোধন করা এবং সম্পাদনার কাজ তিনি স্বহস্তে করেন। এমনকি তিনি নিজ হাতে পত্রিকাটি বিনামূল্যে বিতরণও করতেন। পত্রিকাটি একবার শুরু হওয়ার পর আর বন্ধ হয়ে যায়নি, পত্রিকাটি এখনও সারা পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৪৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষতার স্বীকৃতিরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে চার বছর পর বানপ্রস্থ-আশ্রম গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বৃন্দাবন শহর পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানে তিনি ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে অতি দীনহীনভাবে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি কয়েক বছর গভীর অধ্যয়ন এবং গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরেই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান—আঠার হাজার শ্লোক সমন্বিত *শ্রীমদ্ভাগবতের* অনুবাদ ও ভাষ্যের কাজ শুরু করেন। *অন্য লোকে সুগম যাত্রা* নামক গ্রন্থটিও তিনি রচনা করেন।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছান। প্রায় এক বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করার পর তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইস্‌কন। তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় এক দশকের মধ্যে গড়ে ওঠে বিশ্বব্যাপী শতাধিক আশ্রম, বিদ্যালয়, মন্দির ও পল্লী-আশ্রম।

১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পার্বত্য-ভূমিতে গড়ে তোলেন নব বৃন্দাবন, যা হচ্ছে বৈদিক সমাজের প্রতীক। এই সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যবৃন্দ পরবর্তীকালে ইউরোপ ও আমেরিকায় আরও অনেক পল্লী-আশ্রম গড়ে তোলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থাবলী। তাঁর রচনাশৈলী গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রাঞ্জল এবং শাস্ত্রানুমোদিত। সেই কারণে বিদগ্ধ সমাজে তাঁর রচনাবলী অতীব সমাদৃত এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ সেগুলি পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক দর্শনের এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশনী সংস্থা ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট। শ্রীল প্রভুপাদ *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের* সপ্তদশ খণ্ডের তাৎপর্য সহ অনুবাদ আঠার মাসে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

১৯৭২ সালে উত্তর আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ১৯৭২ সালে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে এই গুরুকুলের সূত্রপাত হয় এবং আজ সারা পৃথিবীর ১৫টি গুরুকুল বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় পনের শত।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ সংস্থার মূল কেন্দ্রটি স্থাপন করেন ১৯৭২ সালে। এইখানে বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি বর্ণাশ্রম মহাবিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তিনি দিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশে বৈদিক ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত এই রকম আর একটি আশ্রম গড়ে উঠেছে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে, যেখানে আজ দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বহু পরমার্থী বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলন করছেন।

১৯৭৭ সালে এই ধরাধাম থেকে অপ্রকট হওয়ার পূর্বে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগতের কাছে ভগবানের বাণী প্রচার করার উদ্দেশে বৃদ্ধাবস্থাতেও সমগ্র পৃথিবী চোদ্দবার পরিক্রমা করেন। মানুষের মঙ্গলার্থে এই প্রচার-সূচীর পূর্ণতা সাধন করেও তিনি বৈদিক দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি সমন্বিত গ্রন্থাবলী রচনা করে গেছেন, যার মাধ্যমে এই জগতের মানুষ পূর্ণ আনন্দময় এক দিব্য জগতের সন্ধান লাভ করবে।